এই যন্ত্র লইয়া আমরা কী করিব

আনিসুল হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যন্ত্র লইয়া আমরা কী করিব? এই দেশে সবার হাতে মোবাইল, সবার হাতে ক্যামেরা, অনেকের কাছেই ফেসবুক কিংবা ইন্টারনেট সহজপ্রবেশ্য। কিন্তু আমরা কি এসবের জন্য প্রস্তুত? এই প্রশ্ন তুলেছেন আনিসুল হক, তাঁর অরণ্যে রোদন কলামে। এমনিতর নানা প্রশ্ন, দেশ ও জাতি নিয়ে উদ্বেগ, অন্যায়-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হাস্যকৌতুক ও বিদ্রূপ এবং দেশের ভবিষ্যত নিয়ে নিরন্তর আশাবাদ-এইসব থাকে তার অরণ্যে রোদন কলামে। সেসব নিয়েই এইবই। আপনাকে ভাবাবে, হাসাবে, কাঁদাবে এবং অনুপ্রাণিত করবে এইবই।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

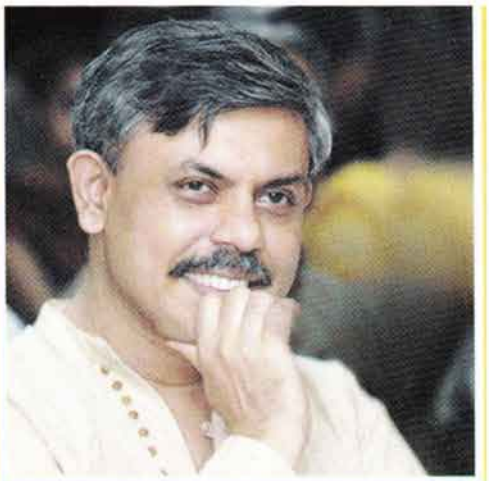

আনিসুল হকের জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, রংপুরের নীলফামারীতে। পিতা মরহুম মো: মোফাজ্জল হক, মাতা মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম। জন্মের পরেই পিতার কর্মসূত্রে তারা চলে আসেন রংপুরে। রংপুর পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ আর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন তিনি। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রকৌশলী হিসেবে একবার যোগ দিয়েছিলেন সরকারি চাকরিতে, কিন্তু ১৫ দিনের মাথায় আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতা তথা লেখালেখিতেই। বর্তমানে একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকে সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কমবেশি তাঁর বিচরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, কলাম, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, ভ্রমণকাহিনী, কাব্য-উপন্যাস, শিশুতোষ রচনা—নানা কিছু লিখেছেন। গদ্যকার্টুন নামে লেখা তাঁর কলাম খুবই পাঠকপ্রিয়।

মা ইংরেজিতে 'ফ্রিডম'স মাদার' নামে অনূদিত ও দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। উড়িষ্যা থেকেও ওড়িশি ভাষায় বেরিয়েছে *মা*-এর অনুবাদ।

সাহিত্যের জন্যে পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার, সিটি ব্যাংক আনন্দআলো পুরস্কার, খালেকদাদ চৌধুরী পদক, খুলনা রাইটার্স ক্লাব পদক, কবি মোজাম্মেল হক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার, সুকান্ত পদক, ইউরো শিশুসাহিত্য পুরস্কার। তাঁর উপন্যাস *মা* পাঠ করে সরদার ফজলুল করিম তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন : 'আমি বলি দুই মা। ম্যাক্সিম গোর্কির মা আর আনিসুল হকের মা। . . . এখন দুই মা যথার্থ মা হয়ে উঠেছেন আমার কাছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যন্ত্র
লইয়া
আমরা
কী করিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যন্ত্র লইয়া আমরা কী করিব

আনিসুল হক

অনুপম প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

প্রিয় প্রভাষ আমিন
এককালের সহকর্মী
ভালো মানুষ
ভালো লেখক
ভালো সাংবাদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

প্রথম আলো পত্রিকায় গত এক বছরে প্রকাশিত অরণ্যে রোদন কলাম নিয়ে এই বই। বই হিসেবে প্রকাশের আগে লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মনে হলো, মন্দ কী! হা হা!

অনেক পাঠকই আমাকে বলেন, আপনার কলামগুলো একসঙ্গে পড়তে চাই। এই হচ্ছে সেই বই।

সবাইকে শুভেচ্ছা।

আনিসুল হক
৯ জানুয়ারি ২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যন্ত্র লইয়া আমরা কী করিব

দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি নামের একটি চলচ্চিত্রে একটা ঘটনা ঘটেছিল। কালাহারি মরুভূমিতে একটা কোকা-কোলার বোতল এসে পড়েছিল উড়োজাহাজ থেকে। ওই এলাকার লোকেরা, যাদের বলা হয়েছে বুশম্যান, জংলি, তারা এর আগে শান্তিতেই ছিল। তারা এর আগে কোনো দিন কোনো কোকা-কোলার বোতল দেখেনি, যন্ত্রজাত কোনো কিছুই দেখেনি। আকাশ থেকে পড়া কোকের বোতলটিকে তারা দেবতার পাঠানো কোনো সামগ্রী বলে ভুল করে। ওই কোকের বোতলটা কে নেবে, ওটা দিয়ে কী করা হবে, এই নিয়ে শুরু হয় নানা ঘটনা-অঘটনা। বাংলাদেশে আমরা আসলে জংলি কিংবা অসভ্য মানুষদের মতোই আচার-আচরণ করে থাকি। আমরা যথেষ্ট পরিপক্ব হইনি, আমাদের শিক্ষা নেই, সভ্যতা কিংবা গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা নেই, এ-সংক্রান্ত কোনো মূল্যবোধকেই আমরা ধারণ করি না, আমাদের সমাজ না সামন্ততান্ত্রিক, না পুঁজিবাদী, না গ্রামীণ, না যান্ত্রিক; আমাদের শিক্ষা আমাদের আলোকিত করে না, আমাদের অসৎ করে, লোভী করে, ভোগী করে, সুবিধাবাদী করে, অত্যাচারী করে। আমাদের গণতন্ত্র পরমতসহিষ্ণুতা শেখায় না, আমাদের ধরাকে সরা জ্ঞান করার ক্ষমতা দেয়, আমরা সবকিছুই নিজের তালুক মনে করে যা খুশি তা-ই করি। নিয়মকানুন, আইনশৃঙ্খলা বলতে জগতে কোনো কিছু আছে বলে আমাদের ধারণাই থাকে না। এই রকম একটা বুশম্যান বা জঙ্গলমানুষদের এলাকায় আকাশের উড়োজাহাজ থেকে কোমল পানীয়র বোতলের মতো করে হঠাৎ এসে যায় মোবাইল ফোন, এসে যায় ইন্টারনেট, ফেসবুক। মোবাইল ফোনে আবার ক্যামেরা আছে, সেটা দিয়ে ছবি তোলা যায়, ভিডিও করা যায়। আমরা, এই জঙ্গলমানুষেরা আকাশ থেকে পড়া এই সব আজগুবি যন্ত্র পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি, এই যন্ত্র লইয়া আমরা কী করিব?

আমরা মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেটের প্রযুক্তি লাভ করলাম। সেই দেশে, যে দেশে রাস্তায় কোনো একটা গাড়ি কোনো পথচারীকে কারণে-অকারণে ধাক্কা দিলে তার পরিণতি হয় হাজার হাজার মানুষের রাস্তায় নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসা, আর নির্বিচারে গাড়ি ভাঙচুর করা। যদি কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন, তা হলে আশপাশের সব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দলে দলে শিক্ষার্থীরা নেমে আসবে পথে, ভাঙো গাড়ি। একই ঘটনা ঘটবে যদি কোনো গার্মেন্টস শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হন। একবার, এক পুলিশ সদস্য সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে পুলিশের জোয়ানরা পর্যন্ত বেরিয়ে এসে রাস্তায় ভাঙচুর করেছিলেন, বেশ কয়েক বছর আগে। কয়েকজন শিক্ষার্থী রাতের বেলা আড্ডা দিতে গিয়েছিল আমিনবাজারের ওপাশে, ডাকাত সন্দেহে তাদের পিটিয়ে মারা হয়েছে মাত্র সেদিন। টেলিভিশনের খবরে প্রায়ই দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুদল ছাত্র ইয়া বড় বড় চাপাতি, রামদা, তরবারি, লাঠিসোঁটা এমনকি পিস্তল উঁচিয়ে পরস্পরকে ধাওয়া করছে। আপনারা কি কেউ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কিংবা অ্যানিমেল প্লানেট চ্যানেলে সিংহ বা বাঘের হরিণ শিকারের দৃশ্য দেখেছেন? হরিণের পালের মধ্যে সিংহ চড়াও হয়, একটা-দুটো হরিণকে বাগে পেয়ে যায়। এমনকি দল বেঁধে সিংহ হামলে পড়ে একটা মোষের ওপরেও। ওই যুযুধান ছাত্রের দল বিরোধী পক্ষকে তাড়া করতে থাকলে হঠাৎ করে একজন-দুজনকে পেয়ে যায় বাগে, তখন তার ওপরে লাঠি, চাপাতি ইত্যাদি নিয়ে যেভাবে তারা চড়াও হয়, আর সেটা টেলিভিশনের পর্দায় যেভাবে দেখানো হয়, তার কোনো ব্যাখ্যা হয় না, বুশম্যান বা আদিমেরা এর চেয়ে সভ্য, এমনকি জানোয়াররাও আমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানবিক। পশুকুল কখনো স্বজাতির ওপরে হামলা করে না, সিংহ হরিণ খায়, কিন্তু কম ক্ষেত্রেই সিংহে সিংহে মারামারি হয়।

এই রকম একটা অপ্রস্তুত সমাজে যখন মোবাইল ফোন এল, ইন্টারনেট এল, তখন ওটা দিয়ে আমরা কী করব? আমরা মেয়েদের ছবি তুলতে শুরু করলাম, আর সেটা ছড়িয়ে দিতে লাগলাম ইন্টারনেটে। অন্যের বাথরুমে পর্যন্ত গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে রাখলাম, আর ছবি তুলে তুলে সেটা পোস্ট করতে লাগলাম অন্তর্জালে। নিজেরা নিজেদের ছবি তুলে রাখলাম মোবাইল ফোনে, সেটা হাতছাড়া হয়ে ঘটে গেল মহা সর্বনাশ। আমরা নিরীহ মেয়েদের হয়রানি করে সেই ছবি তুলে রেখে ব্ল্যাকমেইল করতে লাগলাম। মেয়েরা আত্মহত্যা করতে লাগল। কোনো মেয়েকে হয়রানি করতে হবে, তার নামে একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে আজেবাজে কথা লিখে রাখতে লাগলাম।

আমাদের প্রতিবেশী দেশে সমস্যা হলো আরও প্রকট। সেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি উসকে দেয়ার জন্য মোবাইল ফোন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এটা প্রতিরোধের চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে আমরা ঘটালাম এক ভয়াবহ, ন্যক্কারজনক, লজ্জাজনক, ঘৃণ্য ঘটনা। ফেসবুকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার মতো ছবি একটা পাওয়া গেছে। কার অ্যাকাউন্টে? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অমুকের অ্যাকাউন্টে। ফেসবুক যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁরা জানেন, ফেসবুকের ছবি যেকোনো কারও হোমে আসতে পারে, সেটার সঙ্গে ওই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের কোনো সম্পর্ক লাগে না। তারপর আবার যে কেউ যেকোনো ছবি বা লেখা বা মন্তব্য যেকোনো কারও পাতায় সেঁটে দিতে পারে। এটা অনেকটা এই রকম, আপনি আপনার বাড়িতে নেই, সাত দিন বিদেশে ছিলেন, এসে দেখলেন, আপনার দেয়ালে কেউ একটা মানহানিকর পোস্টার সেঁটে দিয়েছে। আপনি দেখামাত্র সেটা সরিয়ে ফেললেন। ওই পোস্টারের জন্য আপনি দায়ী নন। এটা করেছে কোনো এক গুপ্ত অপরাধী, যে কিনা আপনাকে বিপদে ফেলতে চায়। উন্মাদ, মানসিক রোগী শুধু এই দেশে নেই, সারা পৃথিবীতে আছে। প্রতিটা মানুষের বিশ্বাসই যে শ্রদ্ধার বিষয়, এটা অনেকেই মানে না। তারা চরম আপত্তিকর জিনিসপত্র বানায়, এর নামে ওর বিরুদ্ধে। ইন্টারনেটে নেই, এমন কিছুই নেই। যে কেউ চাইলে ফেসবুকে ইন্টারনেটে যেকোনো কিছু করতে পারেন। আপনি চাইলেই বিশ্বব্যাংক সভাপতির নামে অ্যাকাউন্ট খুলে তাতে ছবি দিতে পারেন যে তিনি পদ্মা সেতুতে টাকা না দেয়ার জন্য আবুল হোসেনের কাছে মাফ চাইছেন। কিন্তু ওটা বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জানবেনও না, বুঝবেনও না। মরহুম লেখক হুমায়ূন আহমেদ ফেসবুক ব্যবহার করতেন না, কিন্তু তাঁর নামে অ্যাকাউন্ট ছিল একাধিক, এখনো আছে। ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের নামে অন্তত সাত-আটটা অ্যাকাউন্ট আছে, যার একটাও সাকিবের নয়।

রামুর ঘটনায় আলোচিত ওই তরুণের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কে দেখেছে? ডেইলি স্টার-এর উপসম্পাদক ইনাম আহমেদ গিয়েছিলেন ঘটনাস্থলে, সেখান থেকে পাঠিয়েছেন মর্মস্পর্শী সব প্রতিবেদন। আমাকে তিনি জানিয়েছেন, তিনি অন্তত ২০০ জনকে জিজ্ঞেস করেছেন, তাদের কেউই ফেসবুক খুলে ওই ছবি দেখেনি, যার প্রতিবাদে এত কাণ্ড। তা হলে এত ক্ষোভ, এত আগুন কেন। কারণ, একটা খুবই আপত্তিকর, অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে, এমন ছবি ইন্টারনেট থেকে নেয়া হয়েছিল মোবাইল ফোনে। তারপর সেই ছবি ব্লু-টুথে গেছে এক মোবাইল ফোন থেকে আরেক মোবাইল ফোনে। সেটা কেউ কেউ দেখেছে, আবার অনেকেই দেখেনি। যারা দেখেছে, তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে। জানানো হয়েছে, এটা করেছে অমুক বড়ুয়া। আর যায় কোথায়?

কিন্তু তার পরেও সন্দেহ থেকে যায়। এই ধরনের বিক্ষোভ রাতের বেলায় হয় না। এই ধরনের বিক্ষোভে গাড়ি করে লোক আনা হয় না। সরকার তো ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই বলছে, এটা পূর্বপরিকল্পিত। পূর্বপরিকল্পিতই যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে, তা হলে সরকার করলটা কী? গোয়েন্দারা করলটা কী? ওই এলাকা তো বিশেষ এলাকা। রোহিঙ্গা ইত্যাদি কারণে সেখানে আমাদের বিভিন্ন বাহিনী ও এজেন্সির সদা সক্রিয় থাকার কথা! তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার আগেই 'এ' দল বলছে, এটা 'বি' দল করেছে, 'বি' দল বলছে, এটা 'এ' দলের কাণ্ড। দায়িত্বশীল মহল থেকে বলা হয়েছে, এটা বিদেশি চক্রান্ত। বিদেশিরা এই দেশে বসে চক্রান্ত করে, আর আমরা ঘোড়ার ঘাস কাটি?

অনুমান করতে পারি, এটা 'এ' দল করতে পারে, 'বি' দল করতে পারে, 'জে' দলও করতে পারে, দেশিরা করতে পারে, বিদেশিরা করতে পারে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যারা চায় না, তারা করতে পারে, রোহিঙ্গারা করতে পারে। কিন্তু ঘটনা হলো, শত শত মানুষ এই অপকর্মে যোগ দিয়েছে। সেখানে এ দল ও দল মিলেমিশে গেছে। এমনকি পুলিশের থানাকর্তাও বক্তৃতা দিয়েছেন। আমাদের সমাজটাই এত অসহিষ্ণু, এত হুজুগে, যেন আমরা একটা বারুদের ঘরে বসবাস করছি। সামান্য ইন্ধনেই এখানে বড় বিস্ফোরণ ঘটানো যায়, ঘটে।

কাকে দোষ দেব। এ আমার পাপ, এ তোমার পাপ। একাত্তর সালেও কি বৌদ্ধদের এতগুলো উপাসনালয় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল? যে ঘুমন্ত শিশুটির ঘুম ভেঙে গেছে শত শত মানুষের চিৎকারে, উদ্বিগ্ন মা যাকে কোলে করে আঁচলের তলে পুরে নিয়ে ছুটেছেন জঙ্গলের দিকে, সেই জঙ্গলে যাদের কেটেছে ভয়ার্ত প্রহর, যে দূর থেকে শুনেছে চিৎকার আর দেখেছে আকাশ লাল করে লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে, দিনের বেলা ফিরে এসে দেখেছে পুড়ে গেছে তার সব, তার খেলনা পুতুলটা, বইপত্র, তাদের আর কিছু নেই, তার মা তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারেননি, তার বাবা পারেননি, তার মহল্লার গুরুজন দিতে পারেননি, তার ভাস্তে পারেননি, ওই শিশুকে আমরা কী সান্ত্বনা দেব?

ইন্টারনেটেই এখন আগুনে পোড়া বৌদ্ধমন্দির আর বৌদ্ধ বসতিগুলোর ছবি দেখতে পাবেন। যদি দেখেন, কান্নায় আপনার চোখ ফেটে আসবে, দুঃখে আপনার বুক ভেঙে আসবে। এই লজ্জা আমরা রাখব কোথায়? এই মুখ আমরা কাকেই বা দেখাব?

আমাদের আশঙ্কা, অন্য অনেক তদন্তের মতো এই তদন্তের কোনো ফল আসবে না। কারণ, তদন্ত হওয়ার আগেই দায়িত্বশীল মুখ থেকে 'কে দায়ী, কারা দায়ী' তা বলে ফেলা হয়েছে। আর প্রথম আলোয় মশিউল আলম যেমনটা লিখেছেন, এখানে সব কটি রাজনৈতিক দলই একাকার হয়ে ভূমিকা পালন করেছে। তার ওপর যুক্ত হয়েছে অসহায় বৌদ্ধ পরিবারের ভিটেমাটিটুকুনের ওপরে লোলুপ শ্যেন দৃষ্টি, 'ওটা দিতে হবে।' মশিউল আলমের আশঙ্কা, এ ধরনের অপকর্ম আবারও ঘটতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশার কোনো আলোই তো আর দেখতে পাচ্ছি না। যেখানে আমাদের আশা, সেই তরুণেরা কোথায়? এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হানাহানির ইতিহাস পুরোনো, খুবই করুণ, খুবই ভয়াবহ, খুবই লজ্জাজনক, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে শুভবাদী মানুষের প্রতিরোধের চেষ্টা, আছে শান্তির স্বপ্নের মানুষদের সমাবেশ। আশির দশকেও আমরা দেখেছি, বন্যায় কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তারুণ্যের মহা-উদ্যোগ। আজ সেই শুভবাদী তরুণেরা কোথায়?

মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক একটা যন্ত্র মাত্র, মাধ্যম মাত্র। এটাকে কেউ কেউ খারাপ কাজের জন্য ব্যবহার করছে। আমাদের তরুণেরা কি পারে না এটাকে ভালো কাজের জন্য ব্যবহার করে দেখিয়ে দিতে? সামাজিক নেটওয়ার্ক তারুণ্যের হাতে ব্যবহৃত হোক শুভবাদের পক্ষে জনমত সংগঠনের কাজে, শুভবাদী মানুষের প্রতিরোধের শক্তিকে জোরালো করার উপায় হিসেবে, এটা কি খুব বেশি চাওয়া হবে?

১৬.১০.২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাবটা মেলান দেখি!

আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল সেও। আমাদের বছর দুয়েকের ছোটই হবে। ভীষণ ভালো ছাত্র ছিল সে। বুয়েটের ছেলেরা সাধারণত ভালো ছাত্রই হয়। সে যে মেধাবী তার একটা প্রমাণ, সে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। এরপর সে বাংলাদেশ সরকারের চাকরি করছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে। আমাদের পাড়ায় তাকে দেখলাম। কী ব্যাপার, তুমি এখানে। ও বলল, 'টিউশনি করতে এসেছি। এখানে আমি একটা বাসায় ছাত্র পড়াই।'

আমি বললাম, এখনো ছাত্র পড়াও?

সে বলল, 'কী করব আনিস ভাই, কয় টাকা বেতন পাই, বোঝেনই তো। ঘুষ খেতে না চাইলে আপনার চাকরির বাইরে কিছু একটা করতেই হবে।'

আমি একটু খোঁজখবর করলাম। ওর বেতন হাজার তিরিশেক টাকার মতো হতে পারে। দুটো বাচ্চা, স্ত্রী, গৃহপরিচারক মিলিয়ে পাঁচজনের সংসার হয়তো তার। বাড়িতে মা-বাবাকে টাকা পাঠানোর প্রশ্নই আসে না। ৩০ হাজার টাকায় তার সংসার কীভাবে চলবে। বাসাভাড়া কমপক্ষে ১৫ হাজার। বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল, টেলিফোন বিল, বাচ্চাদের স্কুলের বেতন–হাজার ছয়েক টাকা চলে যাবেই। বাকি নয় হাজার টাকায় সে খাবে কী, চলাচল করবে কী, কাপড়চোপড় কিনবে কী, আর যদি অসুখ-বিসুখ হয়, চিকিৎসার টাকা তার আসবে কোত্থেকে। একটা টেলিভিশন, একটা কম্পিউটার, একটা রেফ্রিজারেটর যদি সে কিনতে চায়, টাকাটা জোগাড় হবে কী করে?

আর বাচ্চাদের যদি কোচিংয়ে দিতে হয়, গিন্নি যদি একটা শাড়ি কিনতে চান?

আমি যার কথা বলছি, সে বুয়েট থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বেরিয়েছে। সে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা। বাংলাদেশের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলের সে একজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুষ সে খাবে না, সুযোগ থাকলেও না, এটা আমি জানি। তাকে চলতে তো হবে।

আমার আরেক বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। সেও বুয়েটেরই। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ঘুষ খাবে না বলে সে তার সরকারি চাকরির পোস্টিং নিয়েছিল তাদের কম্পিউটার সেন্টারে। যখন তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, তখনো তার বাড়িতে কোনো গৃহপরিচারিকা ছিল না। তার স্ত্রী ঘর মোছেন শুনে আমি বললাম, 'এই, তুমি কী বলো, এই শেষ পর্যায়ে এসে তিনি কেন ঘর মুছবেন!' সে বলেছিল, 'ছয় হাজার টাকা বেতন পাই। চার হাজার টাকা বাড়িভাড়া দিই। এখন তুমি হিসাব মিলিয়ে দাও, আমি মেইড রাখব কী করে।'

আমার বন্ধুটি একটা উপায় বের করল। সে সফটওয়্যারের কাজটায় খুব ভালো দক্ষতা অর্জন করল। এখন সে দারুণ আয় করে। ভালো আছে।

আমি যাদের মাসিক আয় নির্ধারিত, তাদের হয়ে তাদের কথা ভাবতে বসেছি।

মাত্র গতকাল শুনলাম আমাদের গ্রামের বাড়ির খবর। ধানের দাম কম, কিন্তু উৎপাদন খরচ বেশি। কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে।

প্রথম আলো ২ জানুয়ারি লিখেছে, 'জ্বালানির অপর্যাপ্ততা ও উচ্চমূল্যস্ফীতির কারণে বিদায়ী বছর ভালো যায়নি। নিত্যপণ্যের বাজার ছিল বেসামাল, বাড়িভাড়া বেড়েছে লাগামহীন। গুপ্তহত্যার কারণে মানবাধিকার-পরিস্থিতিও ছিল উদ্বেগজনক। নতুন বছরে এসব নিয়ে কোনো বাণী নেই। তবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়ে মানুষকে আশার কথা শোনাতে চেয়েছিল সরকার। আগামী তিন বছরে বিদ্যুতের দাম আরও বাড়বে জেনে নতুন বছরের প্রথম দিনও উদ্বেগহীন হলো না।'

মুদ্রাস্ফীতি যে ঘটছে, সেটা সবাই জানে। জিনিসপাতির দাম বাড়ছে। বাড়ছে বাড়িভাড়া। বাড়ছে গাড়িভাড়া। বাড়ছে বিভিন্ন সার্ভিসের ভাড়া। এখন যে লোকটা প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন পান, তিনি এই পাগলাঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে থাকবেন কী করে, টিকবেন কী করে?

বাংলাদেশে আপনারা যাঁরা অঙ্ক ভালো বোঝেন, তাঁরা দয়া করে হিসাবটা মেলান দেখি, সীমিত আয়ের মানুষজন এই বাজারে সংসারটা চালাবে কী করে?

তবুও বাংলাদেশের মানুষ যে টিকে আছে, তার কারণ, বেশির ভাগ মানুষই দুটো কিংবা তিনটা কাজ করেন। শেকস্‌পিয়ারের ভাষায়, আমার মোমবাতির দুদিকেই আগুন জ্বলছে। এটা সারা রাত টিকবে না। আমরা আমাদের প্রাণশক্তি, আমাদের আয়ু–দুদিক দিয়েই জ্বালিয়ে দিচ্ছি। আমরা প্রত্যেকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করি। সরকারি অফিস থেকে বেরিয়ে লোকে আরেকটা চাকরিতে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যোগ্যতা অনুসারে কোচিং সেন্টার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা এনজিওতে ছোটেন। কেউ বা হাতের কাজ করেন, কেউ বা হাতে বানানো পিঠা নিয়ে দোকানে যান এবং ছাত্ররাও কিছু না কিছু করে। টিউশনি করে, পার্টটাইম কাজ করে। পরিবারের প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে আয়ের চেষ্টা করে। কৃষক-শ্রমিকের পরিবারের ছোট্ট শিশুটি বাদাম বেচে, ফুল বেচে, গৃহকর্ম করে, দোকানে কাজ করে। বাংলাদেশ ভোক্তা সমিতির হিসাবে এক বছরে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে প্রায় ১২ ভাগ। তার মানে যে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করেছে এক বছর আগে প্রতি মাসে, এ বছর তাকে ব্যয় করতে হচ্ছে সাত হাজার টাকার বেশি। এই টাকাটা তাকে হয় আয় করতে হবে, নয়তো তার বাজেট কমাতে হবে। প্রথম আলোয় খবর বেরিয়েছিল, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো তাদের খাদ্যতালিকা থেকে মাছ-মাংস বাদ দিচ্ছে, বেড়ানো বা কেনাকাটা করার মতো সামান্য শখগুলো তাদের বিসর্জন দিতে হচ্ছে। এর মধ্যে কর্মসংস্থানের নতুন খবর নেই, বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়বে–এ ধরনের কোনো সুসংবাদ নেই; বরং কোনো কোনো দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা পণ্য হয়ে গেছে, টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে হয়। স্বাস্থ্যও তা-ই। বাসাভাড়া বাড়ছে। গ্যাস, বিদ্যুতের নতুন সংযোগ দেয়া স্বাভাবিক নিয়মে বন্ধ। ঢাকায় পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, সারা দেশেই যাচ্ছে। বস্তুত ১০ বছর পরে ঢাকায় পানি উঠবে কোন পাতাল থেকে, কে জানে।

পেটে খেলে পিঠে সয়। পেটে খাবার নেই, তবুও পিঠে কিলটি দেয়ার গোসাঁইয়ের অভাব নেই। গুপ্তহত্যার ঘটনা ঘটছে। গুপ্তহত্যায় স্বজন হারানো একজন বিলাপ করে বলেছেন, এর চেয়ে ক্রসফায়ার ভালো ছিল, অন্তত জানা যেত, লোকটা মারা গেছে। কিন্তু এ তো মহা অনিশ্চয়তা। যে দেশে বিনা বিচারে মানুষ মারার পরে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়, সে দেশে লোকেরা আইনের শাসনের ওপর আস্থা রাখবে কী করে! কাজেই চলছে গণপিটুনি। ডাকাত সন্দেহে নিরীহ তরুণদের হত্যা তো আমাদের শাসন-নীতিরই প্রতিক্রিয়া মাত্র এবং গুপ্তহত্যা যদি চলতে থাকে, তাহলে ভুয়া র‍্যাবের সংখ্যা বাড়বে, পুলিশ বা র‍্যাবের সোর্স পরিচয় দেয়া প্রতারকদের সংখ্যাধিক্য দেখা দেবে, রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক বা পারিবারিক দ্বন্দ্বে ক্রসফায়ার বা গুপ্তহত্যার মহৌষধ প্রয়োগের ঘটনা বাড়বে এবং অপরাধীরা এ-ওকে খুন করে গুপ্তহত্যা বলে চালিয়ে দেবে। সৃষ্টি হবে এক মহানৈরাজ্য। তার ওপর আছে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস-মাস্তানি। গানের অনুষ্ঠানে কে সামনে চলে এসেছে কিংবা বার্ষিক ভোজের আয়োজনের ত্রুটি বের করতে গেলি কেন, এ নিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা চড়াও হচ্ছে সহপাঠীদের ওপর, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে, হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে আছে আহত ছাত্ররা, কাগজে ছবি বেরিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব দুশ্চিন্তা, সমস্যা ও সংকট নিয়ে নববর্ষ এসেছে আমাদের দ্বারে। অথচ গত একটা বছরে বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়নি, কোনো সন্ত্রাসী বোমা হামলা হয়নি, পাকিস্তানের চেয়ে সে সব দিক থেকে আমরা কত ভালোই না আছি। তাই বলি, আমাদের শোকর করতে হবে যে অবস্থা এর চেয়ে খারাপ হয়নি। রাজপথে মারামারি-হানাহানি সামনের বছর অবশ্যম্ভাবী, বিগত বছরে সরকার সেধে সেই পথ তৈরি করেছে। ন্যূনতম রাজনৈতিক সমঝোতার কোনো লক্ষণও নেই। অথচ এই একটা ক্ষেত্রে সমাধানটা সরকারের জানা।

আমাদের কয়লাসহ বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করতে পারতেই হবে। আর আমাদের কূটনীতি হওয়া উচিত জনশক্তি রপ্তানিকেন্দ্রিক, প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণই হওয়া উচিত কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য। সরকার অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের জন্য একটা সহজ পথ অবলম্বন করতে পারে। প্রবাসীদের জন্য একটা আবাসন প্রকল্প তৈরি করে প্রবাসীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করতে পারে। কিন্তু এ বড়ই টোটকা পদ্ধতি।

আসলে এই সরকারের প্রধান শত্রু তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাকে আত্মম্ভর করেছে। তার যে স্বাভাবিক মিত্র ছিল, মিত্রদের মধ্যে যে বিশেষজ্ঞরা ছিলেন, তাঁদের সবাইকে দূরে ঠেলে দিয়ে সরকার একলা পথ চলতে চেয়েছে এবং কখনো কখনো মিত্রদের শত্রুতে পরিণত করেছে। এ দেশে মুক্তিযুদ্ধের পরে শক্তিই তো বেশি। তাদের মধ্যে যোগ্য, দক্ষ মানুষও প্রচুর। সরকার ভেবেছে তার কারও সহযোগিতার দরকার নেই। সে একলাই চলতে পারে।

এ অবস্থায় নতুন বছরের শুরুতে আশার কোন খবরটা আপনাদের আমরা দিতে পারি। একটা খবর দেখলাম। আমাদের সমুদ্র-অঞ্চলকে জলদস্যুতার অতিঝুঁকির তালিকা থেকে সম্প্রতি বাদ দেয়া হয়েছে। অভিনন্দন।

০১-০১-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী কামালের হাতঘড়ি

কাজী কামাল ছিলেন বাস্কেটবল খেলোয়াড়। পূর্ব পাকিস্তান দলেই জায়গা হয়েছিল তাঁর। পরে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ হয়েছিলেন।

একাত্তর সালে তাঁর বয়স ছিল বছর পঁচিশেক। তিনি যুদ্ধে যাবেন। আগরতলা গিয়ে ট্রেনিং নেবেন। তাঁর যাওয়ার কথা ফতেহ চৌধুরীর সঙ্গে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের খানিকক্ষণ পরে তিনি যান ফতেহ চৌধুরীর বাসায়। ফতেহ চৌধুরী নয়, তাঁর ভাই শাহাদত চৌধুরীর দেখা পান। শাহাদত বলেন, 'ওরা তো তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে শেষে রওনা দিয়ে দিল। এখনই যাও সদরঘাটের দিকে। মতলবের লঞ্চে খোঁজ করো।'

কাজী কামাল ছুটলেন সদরঘাটের দিকে। সদরঘাটে গিয়ে তিনি দেখা পান ফতেহ চৌধুরীর। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন তরুণ। তাঁরা সবাই যাচ্ছেন মেজর খালেদ মোশাররফের ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিতে।

ফতেহ বলেন, 'এসেছ ভালো করেছ। কিন্তু যারা যাচ্ছে সবাই ১৭০ টাকা করে জমা দিচ্ছে পথখরচ হিসেবে। তুমি যেতে চাইলে তোমাকেও ১৭০ টাকা জমা দিতে হবে।'

কাজী কামাল মুশকিলে পড়েন। কারণ তাঁর পকেটে টাকা নেই।

'তাহলে তোমার যাওয়া হবে না।' তাঁরা জানিয়ে দেন।

'এক মিনিট, আমি আসছি' বলে কাজী কামাল লঞ্চ থেকে নেমে পড়েন, একটু পরে ফিরে আসেন হাতে টাকা নিয়ে।

'নাও। তোমাদের ১৭০ টাকা।' কাজী কামাল হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর হাতে টাকা।

'কই পেলে?'

কাজী কামাল জানান, তিনি তাঁর বাবার দেওয়া হাতঘড়িটা বিক্রি করে দিয়ে এসেছেন সদরঘাটের ফুটপাতে।

কাজী কামালেরা ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে ঢাকা শহরে এবং এর আশপাশের এলাকায় অনেকগুলো বীরত্বপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানি সেনাদের নাভিশ্বাস তুলে ছেড়েছিলেন তাঁরা। সেসবের অনেকগুলোর বর্ণনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা পাব জাহানারা ইমামের লেখা *একাত্তরের দিনগুলি* গ্রন্থে। তাঁর সহযোদ্ধা হাবিবুল আলম বীর প্রতীকের লেখা *ব্রেভ অফ হার্ট* গ্রন্থে পাব বিস্তারিত। *ব্রেভ অব হার্ট* বই অবলম্বন করে ১৯৭১ সালের ঢাকার একটা সন্ধ্যার বর্ণনা খানিকটা তুলে ধরছি।

২৫ আগস্ট। সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা। কয়েকজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা বেরিয়েছেন অভিযানে। তাঁরা একটা মাজদা গাড়ি হাইজাক করেছেন। গাড়িটা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের কালভার্ট পেরিয়ে ডানে ঘুরল।

ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কে সাত-আটজন পাকিস্তানি সেনা প্রহরারত। সম্ভবত কোনো আর্মি অফিসারের বাড়ি। সেনারা বেশ অসতর্ক অবস্থায় আছে।

গাড়ির পেছনে বসে আছেন বদি আর কাজী কামাল। তাঁদের হাতে স্টেনগান।

গাড়িটা ওই বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে নীরবে গতি কমিয়ে দিল। হাবিবুল আলম বললেন, 'ফায়ার।'

গর্জে উঠল বদি আর কাজী কামালের হাতের স্টেনগান।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেনারা লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়।

ওই আক্রমণ পরিচালনা করেই তাঁরা নিরস্ত হলেন না। তাঁরা এগিয়ে গেলেন মিরপুর রোডের দিকে। সেখানে সেনারা এরই মধ্যে ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি চেক করতে শুরু করেছে। সেখানে খোটা দুই মিলিটারি ট্রাক ও একটা জিপ দাঁড় করিয়ে রাখা।

তাঁদের গাড়ি সেই সেনা তল্লাশির কাছে যেতেই সেনারা অর্ডার করল, হল্ট। এবং ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই গর্জে উঠল কাজী কামাল, বদি, স্বপন, রুমিদের অস্ত্র।

পাল্টা আক্রমণের আগেই তাঁদের গাড়ি ছুটছে। কিন্তু পেছনে ধাওয়া করল আর্মি জিপ...

পুরো বর্ণনাটা যদি হাবিবুল আলমের বইয়ে পাঠ করেন, তাহলে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাবেই।

এ রকম অনেকগুলো অপারেশনে অংশ নিয়েছেন কাজী কামাল। হাবিবুল আলম বীর প্রতীক তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'কাজী কামাল ছিলেন ঢাকার ক্রীড়াঙ্গনের উজ্জ্বল তারকা। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন কাজী ভাই। তার একটা গুণ সবাইকে আকৃষ্ট করত। তিনি কখনও পেছনের দিকে তাকাতেন না। তিনি কখনও হতোদ্যম হয়ে হাল ছেড়ে দিতেন না। যখনই দরকার পড়ত, তিনি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেন। তিনি ছিলেন অসমসাহসী, যেকোনো মুহূর্তে পাকিস্তানি সৈন্যদের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত ছিলেন।'

আমার *মা* বইয়ের আজাদের ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিলেন কাজী কামাল। ১৯৭১ সালে ৩০ আগস্ট রাতে আজাদদের বাড়িতেই ছিলেন তাঁরা। বেশ কজন মুক্তিযোদ্ধা সে রাতে ছিলেন আজাদদের বাড়িতে। ছিলেন ক্রিকেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলোয়াড় মুক্তিযোদ্ধা জুয়েল...মাথার কাছে কাজী কামালের পিস্তলটা নিয়ে। কাজী কামাল ছিলেন শুধু লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায়। গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনারা ঘিরে ফেলে বাড়িটা। দরজায় আঘাত করে। সেনারা ভেতরে ঢুকে জুয়েলের জখমি হাতে আঘাত করলে কাজী কামাল পাকিস্তানি মেজরের হাত থেকে স্টেনগান কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। গুলি বেরিয়ে যায়। আজাদের চাচাতো ভাই জায়েদ ও টগর গুলিবিদ্ধ হন। কাজী কামালের পরনের লুঙ্গি খুলে গেলে সুতোহীন শরীরে কাজী কামাল ওই বাড়ি ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

আজাদ, জুয়েল, বাশার যাঁরা ওই বাড়িতে ধরা পড়েন, তাঁরা আর ফিরে আসেননি।

কিন্তু কাজী কামাল ১৫ জানুয়ারি ২০১২ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

মা বইটা লেখার সময় আমি কাজী কামালের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁর সাক্ষাৎকার নিই। এই রকম দিলদরিয়া মানুষ আমি আর দ্বিতীয়টা দেখেছি বলে মনে হয় না। সারাক্ষণ হো হো করে হাসেন।

আমাকে পরে বলেছেন, 'আরে মিয়া, আমি তো জানছি তুমি সাংবাদিক, কী চাকরি করো না করো, খাইতে টাইতে পাও না, তোমারে কিছু সাহায্য করুম। তো তুমি দেখি ভালোই আছ। তোমার তো সাহায্যর দরকার নাই মনে হইতাছে।'

তিনি প্রায়ই *প্রথম আলোয়* আসতেন। নিজের জন্য নয়। তাঁর বন্ধুর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে। আসল উদ্দেশ্য বন্ধুকে সহায়তা করা। শেষের দিকে তাঁর স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়ল। কিডনিতে সমস্যা। নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হয়। এই অবস্থায় কিছুদিন আগে আবার *প্রথম আলোয়* এলেন তিনি। আমাকে বললেন, 'বারাইছিলাম ডায়ালাইসিস করাইতে। করাইলাম, তারপর ভাবলাম তোমার লগে দেখা কইরা যাই। শুনো, আমার ছেলেরে কইবা না, একটা মহিলা বাসাভাড়া দিতে পারতাছে না। আমারে খুব ধরছে। দুই মাসের বাসাভাড়া বাকি। আমার এই অবস্থায় কেমনে আমি তারে সাহায্য করি। আমার ছেলে জানলে খুব রাগ করব।'

আমি বললাম, 'আপনি যান, টাকাটা জোগাড় করি। আমি ওই মহিলার কাছে দুই মাসের ভাড়া পাঠায়ে দেব।'

'শোনো, তুমি কিন্তু ধার দিতাছ। আগে কও ফেরত লইবা?'

আমি বলি, 'কামাল ভাই, আপনার শরীর খারাপ। ডায়ালাইসিস করে এসেছেন। এত কথা বলার দরকার নাই তো। মহিলার ঠিকানা দেন। আমি টাকাটা জোগাড় করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তিনি চলে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বিস্মিত। ডায়ালাইসিস সেরে এসেছেন, ঠিকমতো হাঁটতে পারছেন না। আর তিনি পরোপকার ব্রতে বেরিয়েছেন।

আমার সঙ্গে কিছুদিন আগেও তাঁর ফোনে কথা হয়েছে। *মা* বইটার ইংরেজি অনুবাদ বেরুচ্ছে দিল্লি থেকে। পাণ্ডুলিপি সম্পাদক আমাকে ই-মেইলে প্রশ্ন করেছেন, 'সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে আজাদ রোজ নতুন নতুন কাপড় পরে যেত, এটা কী করে হয়? ইউনিফর্ম ছিল না?'

আমার সূত্র তো কাজী কামাল। আমি ফোন করলাম তাঁকে। কাজী কামাল বললেন, 'না না, ছোটবেলায় আমরা ইউনিফর্ম পরে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে যাইনি।
'

আমি বললাম, 'কেমন আছেন?'

উনি বললেন, 'জানো না মিয়া, আমার তো ক্যানসার। হা হা হা।' বলেই তিনি তার সেই ভুবন-কাঁপানো হাসিটা দিলেন। কাজী কামাল উদ্দীন বীর বিক্রমের এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে সিয়ামের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। তিনি ব্যবসা করছেন এবং ভালো করছেন। বাবার চিকিৎসার দায়িত্ব ছেলে যত্নের সঙ্গেই পালন করছিলেন।

গত পরশু বিকেলে সিয়াম ফোন করে বললেন, 'চাচা, আব্বা কিন্তু আর তিন চার দিনের বেশি সারভাইভ করবেন বলে ডাক্তাররা আশা করছেন না।'

'কোন হাসপাতালে আছেন?'

'ইউনাইটেড।'

'আচ্ছা।'

আমি ভাবলাম, যাব। দেখা করে আসব। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফোন। 'চাচা, আব্বা আর নাই।'

আমি ভাবছি কাজী কামালের সেই শখের ঘড়িটার কথা। যে ঘড়িটা তাঁর আব্বা তাঁকে দিয়েছিলেন। যেটা তিনি দেশের জন্য অবলীলায় ২৫ বছর বয়সে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আর ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতেও যিনি পরোপকারের জন্য আমার অফিস পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন।

আসলে নিজের জীবনটাকেই কি এই মুক্তিযোদ্ধারা উৎসর্গ করে রাখেননি? কাজী কামালের সহযোদ্ধারা, বদিউল আলম, রুমী, জুয়েল, আজাদ, বাকী... কতজনই তো ওই একাত্তরেই আর ঘরে ফেরেননি। কাজী কামাল তাঁর সাহস আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে ১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট রাতে বেঁচে গিয়েছিলেন।

আজ কাজী কামাল চললেন তাঁর শহীদ সহযোদ্ধাদের দেশে।

তাঁকে লাল সালাম।

১৪-০২-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬ কোটি মানুষের কী দোষ?

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আমাদের গ্রামের বাড়ি। আগে ওই এলাকায় কার্তিক মাসে আকাল পড়ত, ওই গ্রামের বহু লোক অনাহারে-অর্ধাহারে থাকত। এখন কার্তিকের সেই মঙ্গা আর আমাদের গ্রামে নেই। এর একটা কারণ হলো, আমাদের গ্রামে এখন কলার চাষ হয়। কার্তিক মাসে কলা ওঠে, সেটা বেচে এলাকাবাসী অন্ন জোগাড় করতে পারে। আগে কেন তাহলে কলার চাষ হতো না? এখন কেন হয়? কারণ, যমুনা সেতু। আমাদের গ্রামে খড়ের ঘরগুলো টিনের ঘর হয়ে গেছে। একটা সেতু একটা জনপদের চেহারা পাল্টে দিতে পারে, এটা আমরা চোখের সামনে ঘটতে দেখলাম।

পদ্মা সেতু যে আমাদের খুবই দরকার, এটা সবাই জানে। ২০১০ সালেও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বলেছে, পদ্মা সেতু বাংলাদেশের জিডিপি ১ দশমিক ২ ভাগ বাড়িয়ে দেবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য পদ্মা সেতু জিডিপি বাড়াবে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। তিন কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হবে এই সেতুর দ্বারা। জিডিপি বাড়লে উপকৃত হবে পুরো দেশ, দেশের ১৬ কোটি মানুষ। দেশের ওই অঞ্চলটা এখন সবচেয়ে গরিব। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করাও তো আমাদের কর্তব্য। তারও পরে পদ্মা সেতুর সঙ্গে যুক্ত আছে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নটি, সোজা কথায় ভারতের জন্য ট্রানজিট।

পদ্মা সেতু যে আমাদের দরকার, সেটা আমরা খুব ভালোভাবে জানি, বিশ্বব্যাংকও জানে, আর জানে বলেই তারা অর্থ বরাদ্দ করতে এগিয়ে এসেছিল। এখন তারা অর্থ বরাদ্দ করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। কারণ, তারা দুর্নীতির অভিপ্রায়ের প্রমাণ পেয়েছে এবং সেটা উচ্চপর্যায়ে।

এইখানে এই পুরোনো গল্পটি আপনাদের মনে করিয়ে দিই। সন্তান কার, এই নিয়ে ঝগড়া বেধেছে দুই মহিলার। দুজনই দাবি করছেন, সন্তান তাঁর। কাজির আদালতে বিচারপ্রার্থী হলেন দুজনেই। কাজি বললেন, বাচ্চাটাকে তরবারি দিয়ে মাঝ বরাবর দু-টুকরো করো, তারপর দুজনকেই অর্ধেকটা করে দিয়ে দাও। একজন বললেন, ঠিক আছে, আপনি বাচ্চা ওকেই দিয়ে দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাচ্চা লাগবে না। কাজি বললেন, একেই বাচ্চা দিয়ে দাও, এই হলো প্রকৃত মা। প্রকৃত মা তাঁর সন্তানের কোনো ক্ষতি চান না।

বিশ্বব্যাংকের কী যায়-আসে, যদি বাংলাদেশের মানুষ গরিবই থেকে যায়, এক অঞ্চলের মানুষের চলাচলে ও জীবনযাপনে অসুবিধা হয়, তারা বৈষম্যের শিকার হয়। আসবে-যাবে আমাদের। কারণ, এ যে আমাদের দেশ, এই প্রকল্প যে আমাদের নিজেদের প্রকল্প।

আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে এসে, অনেক টাকা-পয়সা খরচাপাতি করে, সম্ভাব্যতা যাচাই, ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ দান, নকশা চূড়ান্তকরণ–সব সম্পন্ন করে তো এখন বলতে পারব না, খেলব না। এ তো আমাদের জন্য ছেলেখেলা নয় যে খেললাম খেললাম, না-খেললাম, চলে গেলাম। হে বালকগণ, তোমাদের জন্য যা ছেলেখেলা, আমাদের জন্য তা জীবনমরণ সমস্যা।

যেহেতু মাথা আমার, তাই মাথাব্যথাও আমার। সেখানেই আমাদের উচিত ছিল, বিষয়টা পেশাদারি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা। বিশ্বব্যাংক কোনো ধোয়া তুলসী পাতা নয়। তাদের বিশেষজ্ঞরাও পৃথিবীজুড়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন, কথাটা তেমনও নয়। বিশ্বব্যাংকের বিষয়ে বহু সমালোচনা আছে, তার কতকটা নীতিগত, কতকটা আচরণগত। পদ্মা সেতু নিয়ে তারা যে একটা চীনা কোম্পানির পক্ষে জোর সুপারিশ করছিল, যারা পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে ভুয়া ছবি দাখিল করেছিল, নিজেদের কাজ হিসেবে চীনের সেতু দেখিয়ে ছবি জমা দিয়েছিল আমেরিকার এক সেতুর, সেটা ধরাও পড়ে–সে কথা এখন আমাদের মন্ত্রীও জানাচ্ছেন। এই প্রকল্পের আন্তর্জাতিক প্যানেলের চেয়ারম্যান জামিলুর রেজা চৌধুরীও সেটা লিখে জানিয়েছেন।

বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্পে সম্ভাব্য দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে। অর্থমন্ত্রী সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'বিশ্বব্যাংকের সন্দেহ নিরসনে আমরা অসাধারণ সব পদক্ষেপ নিয়েছি।' অর্থাৎ আমাদের সরকার সব সময়েই চেয়েছে, এবং এখনো চাইছে, বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু থেকে সরে না যাক, তারা এবং তার সঙ্গে অন্য উন্নয়ন-সহযোগীরা পদ্মা সেতুতে তহবিল জোগাক। আপাতত, সরকারের এসব 'অসাধারণ পদক্ষেপ'-এর ফল কী? বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু ঋণচুক্তি বাতিল করেছে। এখন বাংলাদেশের সামনে বিকল্প করণীয় কী? এক. বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়া, তাদের বুঝিয়ে রাজি করানো, বাতিলকে বাতিল করে প্রকল্প আবার সচল করা। দুই. বিকল্প উৎস থেকে টাকা জোগাড় করা। আমরা জানি, বিকল্প উৎস আসলে নেই, দেশে এত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় নেই, আর বিশ্বব্যাংকের মতো নামমাত্র সুদে ও বহু বছরের মেয়াদে আর কোনো উৎস থেকে তহবিল জোগাড় করা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ যে বলছে, কোনো রকমের দুর্নীতি হয়নি বা দুর্নীতির কোনো সাক্ষী নেই, এ কথাটা কি দেশের মানুষ বিশ্বাস করে? আমার নিজের ধারণা, দুর্নীতিতে বেশ কয়েকবার চ্যাম্পিয়নের কণ্টকমুকুটশোভা যার মাথায়, 'আমরা কোনো রকমের দুর্নীতি করি নাই, করতে চাইও নাই'–তার এ রকম দাবি সত্য হলেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

ঘুরেফিরে কিন্তু সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনের কথাই আসে। বিশ্বব্যাংক নাকি তাঁর পাসপোর্ট আর ব্যাংক হিসাব জব্দ করতে বলেছিল। ওদিকে খোলাখুলি না হলেও ঘুরেফিরে ইনিয়ে-বিনিয়ে, সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের উত্থাপিত প্রশ্নের মধ্যে কথাটা এসে যাচ্ছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হেনস্থা না করার যে অনুরোধ আমেরিকার পক্ষ থেকে করা হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের কাছে, তাতে কর্ণপাত না করার কোনো প্রভাব পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের পদক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত কি-না! অর্থমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর জানা নেই।

এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের নেতৃত্ব বিষয়ে আমার বক্তব্য দুটো। এক. আমরা কি খুব একগুঁয়েমি দিয়ে চালিত হচ্ছি? সড়ক দুর্ঘটনায় তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরের মৃত্যুর সময় একটা জোর আওয়াজ উঠেছিল যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগের। ওই সময়, ইদের প্রাক্কালে দেখা গেল, আমাদের মহাসড়কগুলো খানাখন্দময়। ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে বাসমালিকেরা বাস চলাচল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। সেটাই ছিল সৈয়দ আবুল হোসেনের পদত্যাগের আদর্শ সময়। ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলে ভারতের রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করেন, নিশ্চয়ই তিনি নিজের রেলগাড়ি চালাচ্ছিলেন না, সিগন্যালও তিনি ওঠান-নামান না, তবু তিনি পদত্যাগ করেন, এটা বোঝাতে যে সরকার জেগে আছে, তাদের বিবেক ক্রিয়াশীল আছে। আমাদের দেশে মনে হয়, গণ্ডারের চামড়া আমাদের, বকো আর ঝকো, কানে দিয়েছি তুলো, মারো আর ধরো, পিঠে বেঁধেছি কুলো। এক আবুল হোসেনকে মন্ত্রীর পদে রেখে দেয়া কি তিন কোটি মানুষের ভাগ্যবদলের চেয়েও জরুরি? আমি বলছি না, আবুল হোসেন দুর্নীতি করেছেন, কিন্তু যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়ার জন্য তাঁকেই মানুষ দায়ী বলে ভাবে, এটা মানুষের ধারণা, মানুষের ধারণা প্রমাণ-সাক্ষী দিয়ে চলে না, একটা ভাবমূর্তি জনসমক্ষে নানা কারণে নানাভাবে তৈরি হয়েই যায়। কাজেই আবুল হোসেন যে কেবল পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তা নয়, তিনি তো এই সরকারের ভোট ও জনসমর্থনের জন্যও একটা বড় দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিন কোটি লোকের স্বার্থ বা পদ্মা সেতু তো পরের প্রসঙ্গ, এই সরকার কি আরেকবার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসতে চায় না? এই রহস্য আজও অনুদ্‌ঘাটিতই রয়ে গেল, কেন একজন মাত্র মানুষকে মন্ত্রী করে রাখাটা এত জরুরি হয়ে পড়ল। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তদন্তের স্বার্থের কথা বলে পদত্যাগ করতে পারেন, তাহলে আবুল হোসেন 'যেহেতু বিতর্ক উঠেছে, তাই তদন্তের স্বার্থে আমি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করছি' বলে কেন সরে দাঁড়ালেন না। তারপর তদন্তে যদি প্রমাণিত হতো, তিনি অহেতুক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, আমরা গিয়ে তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে আসতে পারতাম।

অনেক সময় মনে হয়, সরকার নিজেকে খুবই শক্তিশালী মনে করে। হিলারি ক্লিনটনের সফরের পরপরই তাঁর সমালোচনা এমন তীব্রভাবে আমাদের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা করতে লাগলেন, মনে হতে লাগল, আমেরিকা প্রতিবছর বাংলাদেশের কাছে ভিক্ষার থলে নিয়ে এসে হাজির হয়। যেন বাংলাদেশ পৃথিবীর একটা সুপার পাওয়ার, আর আমেরিকা একটা তৃতীয় বিশ্বের দেশ। এ-জাতীয় কথামালার যে কোনো মানে হয় না, সেটা আমরা সবাই জানি।

এখন মনে হচ্ছে, বেশ একটা জেদাজেদির মধ্যে পড়ে গেছে পদ্মা সেতু। তার শিকার হচ্ছে দেশের ১৬ কোটি মানুষ। বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশে বলা যায়, তিনজন মাত্র লোকের জন্য তো একটা দেশের ১৬ কোটি মানুষ দুর্ভোগ পোহাতে পারে না। বিশ্বব্যাংকের লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের উপকারে আসে এমন প্রকল্প সম্পন্ন হতে সাহায্য করা, কয়েকজন মাত্র মানুষের জন্য কোটি মানুষের প্রকল্প থেকে 'খেললাম না' বলে চলে যাওয়া নয়। বিশ্বব্যাংকও ভুল করে। বিশ্বব্যাংকের সুবিধা হলো, বাংলাদেশে তারা আইন প্রণয়ন করিয়ে নিতে পেরেছে, তাদের কোনো আচরণের জন্য বাংলাদেশের আইনে তাদের ধরা যাবে না। বাংলাদেশের নেতা-কর্মী-আমলা-পেশাজীবী কারোরই তো সেই ঢাল নেই।

আর সরকারকে বলব, আবুল হোসেন কী করেছেন, কী করেননি বা প্রকল্প পরিচালক কী করেছেন, কী করেননি, তার দায় তো জনগণের নয়। দেশের ১৬ কোটি মানুষের ওপরে কেন আপনি উচ্চ হারে সুদের ঋণ চাপিয়ে দেবেন? আপনার লোকদের ভাবমূর্তি খারাপ, তার দায়িত্ব তো ১৬ কোটি মানুষ বহন করতে পারে না।

আর দেশের সার্বিক ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে দাঁড়াল? শুধু এই এক প্রকল্পে নয়, জাইকা, এডিপি অন্য প্রকল্পেও টাকা ছাড় দেওয়া স্থগিত করে রেখেছে। শুধু টাকার অঙ্কেই বা কেন ক্ষতি বিবেচনা করব, আমাদের সম্মানের যে ক্ষতি হয়েছে, তার দায় তো নেতাদের নিতেই হবে।

পলিটিকস ইজ দি আর্ট অব কম্প্রোমাইজ। জিদ ধরে বসে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। চোরের ওপরে রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মানে হয় না। তিনজন মানুষকে বসিয়ে দিলে বা সরিয়ে দিলে যদি পদ্মা সেতু হয়, সেটা করাই কি রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় ছিল না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন তো পুরো ব্যাপারটা বেশ লেজেগোবরে হয়ে গেছে। এখন বিচারিক তদন্ত কমিটির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত তো অপরিহার্য। দোষী কাউকে পাওয়া গেলে তাকে শাস্তিও দিতে হবে। আর না পাওয়া গেলে তো কোনো কথাই নেই।

অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দেশের সম্মান রক্ষার কথা। অর্থমন্ত্রী নিশ্চিত যে, 'দুর্নীতি বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, কোনোমতেই সেগুলো সঠিক নয়।' অর্থমন্ত্রী যেহেতু নিশ্চিত, সে ক্ষেত্রে খুব নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া জরুরি।

অর্থমন্ত্রী আরেকটা খুব মূল্যবান কথা বলেছেন। 'আশা করব, দেশের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে সজাগ থাকবেন।' দেশের সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমাকে একজন শিল্পোদ্যোক্তা, যার বিশাল এক শিল্পোদ্যোগের তহবিল একই কারণে আটকে আছে, দুঃখ করে বলেছিলেন, সারা পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজ বিশ্বব্যাংকের সমালোচনায় মুখর আর বাংলাদেশে কয়েকটা লোকের কথিত দুর্নীতির অভিপ্রায়ের কারণে ১৬ কোটি লোকের প্রকল্প বিশ্বব্যাংক আটকে দিচ্ছে, আপনারা তার প্রতিবাদ করছেন না কেন?

১৬-০৩-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাসে এত রোদন কেন?

শীতের শেষটা এমন বিষাদ বয়ে আনল!

ভালোই ছিলাম আইভরি কোস্টে। ওখানে জাতিসংঘের মিশনে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা খুব ভালো করছেন। তাঁদের মনোবল উঁচু, শৃঙ্খলার মান খুব ভালো, পেশাদারি দক্ষতায় তাঁরা জয় করে নিয়েছেন সবার অন্তর। প্রশংসিত হয়েছেন জাতিসংঘের কাছে। সমাদৃত হয়েছেন স্থানীয় মানুষের কাছে। তাঁদের মানবিক গুণাবলি, সেবামূলক কাজ আইভরিয়ানদের চিত্ত জয় করে নিয়েছে। আমাদের অনেক আইভরিয়ান বলেছেন, 'বাংলা গুড'। অন্য একটা-দুটো দেশের নাম নিয়ে তাঁরা আমাদের বলেছেন, 'ওরা ভালো নয়। বাংলা ভালো।' 'রূপসী বাংলা' নামের গ্রাম দেখলে, স্থানীয় মানুষকে বাংলায় অবিরল কথা বলতে দেখলে কোন বাঙালির না ভালো লাগবে!

আইভরি কোস্ট থেকে ঢাকা এসে সোজা চলে গেলাম দিল্লি। *ফ্রিডম'স মাদার* নাম নিয়ে *মা* উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ বেরোল নয়াদিল্লির পালিম্পসেস্ট প্রকাশনী থেকে। একটা প্রকাশনা উৎসব হলো। কারান সিংয়ের মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন আমাদের হাই কমিশনারসহ গণ্যমান্য অতিথিরা। প্রকাশনা উৎসবে কেউ কোনো বই সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলেন না, প্রশংসা করাটাই রেওয়াজ, এই বই নিয়েও তাই হবে, সেটা খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবু, হঠাৎ করে, দিল্লির আইআইসির সুদৃশ্য ক্যাফেতে বসে ভাবনা চলে আসে, আমি এখানে কেন? এই যে এঁরা আতিথেয়তা করছেন, ঔপন্যাসিক-সাংবাদিক ভাস্কর রায় নিজে উদ্যোগী হয়ে বইটা অনুবাদ করালেন, প্রকাশ করলেন, কেন? তিনি আমার কে? হঠাৎ করে ঢাকায় দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, তাঁকে বইটা দিয়েছিলাম, কতজনকেই তো বই দিই। তিনি পড়লেন এবং যেন ব্রত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এই বই বাংলা ভাষার বাইরের লোকদেরও পড়াতেই হবে। ব্যস, এখন আমি দিল্লিতে। লোদি গার্ডেনের শোভা দেখছি। পৃথিবীতে অনাত্মীয়, প্রায় অপরিচিত মানুষের কাছে এমন সব ভালোবাসা পেয়েছি যে কেমন আশ্চর্য লাগে সব কিছু। কিছু তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিনি, বাংলায় কতগুলো বাক্য রচনা করা ছাড়া। তারই সূত্র ধরে এইখানে আসা।

কিন্তু ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অনড় যানজটের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে মনটা কী রকম যেন দমে যেতে লাগল। দিল্লি এত সুন্দর! ওদের বিমানবন্দর এত ঝকঝকে! রাস্তায় যানজট নেই, ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল নানা কিছু করে ওরা সব মসৃণ করে দিয়েছে। অটোরিকশাওয়ালারা মিটারে চলছে, একটা টাকা অতিরিক্ত দাবি করল না। ঢাকা দিল্লির মতো না হোক, অন্তত কলকাতার মতো তো হতে পারে। কলকাতাতেও এখন যানজট নেই, যেই যায়, সেই মুগ্ধ হয়। ঢাকা শহরটা যে চলছে না, স্থবির হয়ে আছে, এটা কি আমাদের কর্তারা জানেন? আর এই সমস্যার সমাধান যে টোটকা পদ্ধতিতে হবে না, একটা সমন্বিত পরিকল্পনা লাগবে, সেই কথাটা উপলব্ধিতে আনার মতো কেউ কি আছেন? হঠাৎ করে একটা ফ্লাইওভার, একটা ফুটওভার ব্রিজ করলে পরে দেখা গেল সেটা সমন্বিত কোনো প্রকল্পের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সেটা তখন ভাঙতে হবে। পাঁচ বছর পর ঢাকা শহরে মানুষ থাকতে পারবে, নাকি এটা একটা পরিত্যক্ত নগরে পরিণত হবে?

দিল্লি থেকে ফিরে ধাতস্থ হইনি। রাতের খবরে জেনি, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু আর নাই। অরুন্ধতী রায়ের *গড অফ স্মল থিংস* বইয়ে একটা কথা আছে–ভায়াব্‌ল ডায়াব্‌ল এজ। আমরা এখন মৃত্যুর বয়স ছুঁয়ে ফেলেছি। টিংকু ভাইয়ের ব্রেন টিউমার হয়েছিল। বছর দুয়েক আগে জেনেছিলাম। তিনি ফেসবুকে লিখেছিলেন সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য। অপারেশন ভালো হয়েছিল, তিনি সেরে উঠবেন বলেই জানতাম। কিন্তু শেষতক বাঁচলেন না। একদিন ফেসবুকে লিখলেন, 'এই, আমার ছেলে তোর ভক্ত, ওকে বন্ধু করে নে।' সে আদেশ আমি মান্য করেছিলাম।

জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু একটা সময়ে আমাদের কাছে নায়ক ছিলেন। আমি যখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তখন তিনি পড়েন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তিনি আর মোজাম্মেল বাবু মিলে বের করেছিলেন শিল্প-সাহিত্যের কাগজ *স্পর্শ*। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের নামধাম, সাক্ষাৎকার পড়ার সুযোগ হয়েছিল ওই *স্পর্শ* নামের কাগজের মাধ্যমেই। টিংকু ভাই ছোটগল্প লিখতেন, আমার কবিতা খুব পছন্দ করতেন, বিশেষ করে এই লাইনটা: 'আসলে আয়ুর চেয়ে বড় সাধ তার আকাশ দেখার।' আমাদের বন্ধু কবি হুমায়ূন রেজার সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন, 'রেজা, তুই এই লাইনটা খুব ভালো লিখেছিস।' রেজা কাঁচুমাচু হয়ে বলত, 'টিংকু ভাই, ওটা মিটুন ভাইয়ের লেখা।' টিংকু ভাইয়ের খুব প্রিয় ছিল বুদ্ধদেব গুহর *মাধুকরী*। আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'সবাই *মাধুকরী* পড়বি।' নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনে আমরা ভীষণভাবে যুক্ত ছিলাম। আমার মনে আছে, এরশাদ সরকারের শেষ দিনগুলো, জরুরি অবস্থা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারফিউ। শুক্রবারে সবাই গেছি বায়তুল মোকাররম মসজিদে, নামাজ শেষে কারফিউ ভেঙে মিছিল বের করা হবে। আমরা মিছিল নিয়ে কাকরাইলের দিকে আসছি। কাকরাইল মোড়ে পুলিশ গুলি আর টিয়ারগ্যাস ছুড়তে শুরু করল। বিজয়নগরের একটা কানাগলির ভেতরে পালাচ্ছি, টিংকু ভাই চিৎকার করে বলছেন, 'মিটুন মিটুন, ওটা কানাগলি। পানি নে। শার্ট ভেজা।' আমার পাশে সাংবাদিক আমিনুর রশীদ, ফজলুল বারী, আমান উদ দৌলা, আনিস আলমগীর, কুদ্দুস আফ্রাদ, ফজলুর রহমান, দীপু হাসান। আমরা বের করছি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বুলেটিন। এরশাদের নিযুক্ত সন্ত্রাসীরা মাইক্রোবাসে করে অস্ত্র নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করল। টিংকু ভাই খালি হাতে সেই গুলির ভেতর দিয়ে ছাত্রদের নিয়ে সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করতে ছুটলেন, সেদিনই তিনি বীর হয়ে গেলেন।

কিন্তু সেইসব আগুন-তাতানো দিন কোথায় ফুরিয়ে গেল। সেই ছাত্রনেতারাই বা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা, সাংবাদিক- লেখকেরা এখন বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন টেলিভিশনে সক্রিয়। কার সঙ্গেই বা কার দেখা হয়। টিংকু ভাইয়ের প্রিয় ছিল ওই লাইন, 'আসলে আয়ুর চেয়ে বড় সাধ তার আকাশ দেখার।' তিনিও, আকাশ দেখবেন বলে জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেলেন।

সেই শোক কাটতে না কাটতেই সাগর সরওয়ার আর মেহেরুন রুনির এমন বিয়োগান্তক মৃত্যুর খবর। আমরা তখন *ভোরের কাগজে*। 'মেলা' নামের একটা ক্রোড়পত্র বের করব। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম–তরুণ লেখক চাই। তখন যাঁরা এসেছিলেন, তুষার আবদুল্লাহ, আবু সুফিয়ান, সুপন রায়–তাঁদেরই সঙ্গে বা একটু পরে এসেছিলেন সাগর সরওয়ার। 'মেলা' পাতায় লেখা দিয়েই তাঁর সাংবাদিকতা শুরু। মেহেরুন রুনিও এসেছিলেন ওই 'মেলা' পাতায় লিখবেন বলেই। আমাদের দুই প্রদায়ক একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেন। তারপর সাগর চলে গেলেন প্রথমে সংবাদে। তারপর ইত্তেফাকে। দূর থেকে তাঁদের সাফল্য দেখি। ভালো লাগে। কিন্তু সকালবেলা টেলিভিশনের পর্দার নিচে তাঁদের দুজনের খুন হওয়ার খবর দেখে সারা ভুবন আঁধার হয়ে এল।

বাংলাদেশের মানুষ আমরা এত নিষ্ঠুর কেন?

বন্ধু ছিল তারা। একই রুমে থাকত। একই ছাত্রসংগঠন করে। পরে তাদের দুটো আলাদা গ্রুপ হয়ে গেল। তারপর এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে হত্যা করল স্রেফ পিটিয়ে। আমরা ছিনতাইকারীদের ধরে যেভাবে গণপিটুনি দিই, কিংবা হরতালের আগে বাসে যেভাবে আগুন দিয়ে মানুষ মারা হয়, তা থেকে মনে হয়, আমরা সভ্য হইনি। হাটহাজারীর ঘটনাও তারই প্রমাণ। এসব ঘটনায় এমন অসহায় লাগে। মনে হয়, কার উদ্দেশে কী লিখছি। কারা আমাদের লেখা পড়েন? আমরা কবে মানবিক হয়ে উঠব? কবে আমরা সভ্য হব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছু মিলে খুব হতাশ, খুব অবসন্ন, খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েছি। রোদনভরা এ বসন্ত–এমন করুণ বসন্ত সত্যি কখনো আর এসেছিল কি! জানি না আরও কত খারাপ সময় আমাদের জন্য সামনে অপেক্ষা করছে।

আইভরি কোস্টে রাস্তায় মানুষ জীবন্ত মানুষের গায়ে আগুন দিচ্ছে, এই ভিডিও ফুটেজ দেখেছি। ওখানে একটা নির্বাচন হয়েছিল। বাগবো আর ওয়াত্তারা দুজনই নিজেকে সেই নির্বাচনে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছিলেন, দুজনেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। তারপর দুই দলে শুরু হলো গৃহযুদ্ধ। দুঃস্বপ্নের মতো ওই দৃশ্য সারাক্ষণ আমাকে তাড়িয়ে ফেরে–আমরাও ওই রকম দিন ডেকে আনছি না তো?

মৌসুমী ভৌমিকের গানে একটা লাইন আছে না, 'কাকে বলি আজ মৃত্যু থামাও?' কাকে বলব, আমাদের মৃত্যু থামান। আমাদের পতন থামান। 'দুঃসময় থেকে সুসময়ে মানুষ পৌঁছে দেবে মানুষকে', নাজিম হিকমতের এই লাইনও যে আর ভরসা জোগাতে পারে না। তবুও ওখানেই আশা রাখতে হবে। মানুষই আমাদের ভরসার নাম। মানুষই আমাদের উদ্ধার করবে এই সমূহ বিনাশের থাবা থেকে।

স্টপ প্রেস: এই লেখাটা শেষ করে মুঠোফোনের দিকে তাকিয়ে দেখি, সাতটি মিস্‌ড কল। তারপর সেই খবর শোনা: হুমায়ূন ফরীদি আর নেই। মাত্র ৬০ বছর। ভায়াব্‌ল ডায়াব্‌ল এজ। এখন ফরীদি ভাইয়ের ধানমণ্ডির বাসা থেকে ফিরছি। ফেরা কি যায়? খালারবাড়ির সামনে গাড়িতে এক ঘণ্টা বসে থাকলাম। গাড়ি নড়ছে না। ঢাকা চলছে না। প্রিয়তম পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে, প্রিয় মানুষগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। মোবাইল ফোনের ভাণ্ডার থেকে আরো একটা নাম মুছতে হবে? চন্দ্রগ্রস্ত মানুষটা এইভাবে চলে গেল! পুরোপুরি শিল্পীর জীবন ছিল তাঁর, চলে যাওয়াটাও হলো শিল্পীরই মতোন। বিদায়, ফরীদি ভাই!

২৮-০২-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি সব গাধা...

'এমনি সব গাধা, ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।' এ তো রবীন্দ্রনাথের জুতা আবিষ্কারের চেয়েও কম বোকামো নয়। 'করিতে ধুলা দূর, জগৎ হলো ধুলায় ভরপুর।' বিরোধী দল ঢাকায় মহাসমাবেশ ডেকেছে। সেই মহাসমাবেশে যাতে লোকসমাগম কম হয়, সে জন্য সরকার যেন হরতাল ডেকে বসল। বাস না পেয়ে ভ্যানে করে ঢাকায় আসছিলেন খেটে খাওয়া কয়েকজন মানুষ, পরিবার-পরিজনসহ, বলেছেন লাখ কথার এক কথা, আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকলেও হরতাল ডাকে, সরকারে থাকলেও হরতাল ডাকে।

'মানুষের কত জরুরি প্রয়োজন থাকে। কাউকে বা বিদেশে যেতে বিমান ধরতে হবে, কারও বা ব্যবসায়িক জরুরি কাজ আছে, কারও বা চিকিৎসা প্রয়োজন, তাঁরা ঢাকায় যাবেন।' এই সব কথা আমি একবার লিখেছিলাম হরতালের সমালোচনা করে। এই কথা লিখতে হচ্ছে সরকার আর সরকারি দলের নেয়া পদক্ষেপগুলোর সমালোচনায়। সরকারের কাজ দেশটা চালানো, দেশটাকে থমকে দেয়া নয়। দু-তিন দিন ধরে ঢাকামুখী লঞ্চ বন্ধ করে দেয়া হলো, বাস বন্ধ করে দেয়া হলো, এ কী দুর্বুদ্ধি! দেশের ভেতরে স্বাধীনভাবে চলাচল করা তো নাগরিক মাত্রেরই মৌলিক অধিকার। আর যে সমাবেশ বেআইনি ঘোষিত হয়নি, সে সমাবেশে যোগদান করাও তো যেকোনো নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সরকার, তার প্রশাসন, পুলিশ, রাজনৈতিক সংগঠন সেই সমাবেশগামী মানুষকে বাধা দিল কোন্ আইনের বলে?

ফেসবুকে একজন বলেছেন, 'আচ্ছা, ঢাকায় যেতে মানা, তা না হয় বুঝলাম, বিরোধী দলের ঢাকা চলো কর্মসূচি আর মহাসমাবেশে বাধা দেয়া তার উদ্দেশ্য; কিন্তু ঢাকা থেকে লোকে বাইরে যাবে, তাতে বাধা দেয়া হলো কেন? তার মানে, সরকারের নির্বুদ্ধিতা চরমে পৌঁছেছে।' সরকারে বুদ্ধিমান লোকের অভাব নেই, এই সাধারণ প্রশ্নটির কোনো অসাধারণ উত্তর নিশ্চয়ই তাঁরা দিতে পারবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের আতঙ্কিত হওয়ার কারণটা অনুমান করা যায়। ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ বিরোধী জোট ঢাকায় 'মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা'র আয়োজন করেছিল। ভোরবেলা থেকে দেখা গেল, বাসে আগুন দেয়া শুরু হয়েছে। ওই সময় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সমালোচনা হয়েছিল যে তারা কেন আঁচ করতে পারেনি ওই মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা নিতান্তই নিরীহ সংবর্ধনা ছিল না, ছিল কোনো বৃহত্তর ফন্দির অংশ। এবার তাই গোয়েন্দা থেকে শুরু করে সরকারের মন্ত্রী, সরকারি দলের সম্পাদকেরা আগে থেকেই মহা তৎপর। 'যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী/ দেশে বিদেশে আছিল যতেক যন্ত্রী, বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,/ ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।' রাস্তাঘাট, নদনদী সব বন্ধ। ঢাকায় লোক ঢুকতে দেয়া হবে না।

মানুষের কষ্ট হলো দুর্বিষহ। হঠাৎ দেখা গেল, রোববার ঢাকায় কোনো গণপরিবহন নেই–না মিনিবাস, না টেম্পো। সদরঘাটে লঞ্চ থেকে নেমে যাত্রী-রা পড়েছেন লাল বাহিনীর উদ্যত লাঠির সামনে।

গতকাল সোমবার ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, রাস্তায় রিকশা পর্যন্ত কম। মাঝেমধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ছুটছে সাইরেন বাজিয়ে আর চলেছে পুলিশের ট্রাক। ভয় পেয়ে গেলাম। কারফিউ নাকি? 'এমনি সব মাঝা, ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।'

জনগণ চলতে-ফিরতে পারছে না, রাস্তাঘাট ফাঁকা। তাতে সুবিধা হলো বেগম খালেদা জিয়ার, ফাঁকা রাস্তাঘাটের তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই গুলশান থেকে নয়াপল্টনে পৌঁছাতে পারলেন। দেড় কোটি লোকের শহরে জনসভার লোকের অভাব হবে? নয়াপল্টন ছাপিয়ে জনসমাবেশ আশপাশের রাস্তা উপচে ছড়িয়ে পড়ল আরও দূরে। 'করিতে ধুলা দূর, জগৎ হলো ধুলায় ভরপুর।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পাত্রমিত্র অমাত্যদের ডেকে অভিনন্দন জানাতে পারেন, তাঁদের কল্যাণেই বিরোধী দলের ডাকা ১২ মার্চের কর্মসূচি আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। এর প্রচারে আওয়ামী নেতারা ও প্রশাসন যে অবদান রেখেছে, খালেদা জিয়া-মাওলানা নিজামীর উচিত তা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা। তাঁরা সারা দেশের মানুষের দৃষ্টি ওই মহাসমাবেশের দিকে আকৃষ্ট করেছেন, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে সমাবেশে লোকসাধারণকে উপস্থিত হতে সাহায্য করেছেন। এই রকম সহযোগিতাই তো আমরা চাই। সরকারি দলে ও বিরোধী দলে সহযোগিতা।

আওয়ামী লীগের মতো আন্দোলন-অভিজ্ঞ দল আন্দোলনকে ভয় পায়? মানুষের সমাবেশকে ভয় পায়? চরম অজনপ্রিয় এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে তিন জোটের মহাসমাবেশের প্রতিটিতে কয়েক লাখ লোক হতো, তা দিয়ে বিএনপি-আওয়ামী লীগ-বাম-জামায়াত মিলে এরশাদ সরকারের পতন ঘটাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছিল কি? আওয়ামী লীগ বা বিএনপি এর আগের মেয়াদে কোনো সরকারকে মেয়াদপূর্তির এক দিন আগে সরাতে পেরেছে? তাহলে?

মানুষকে ভয় কেন পাচ্ছে আওয়ামী লীগ? সত্য বটে, সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, তা তো এ কারণে নয় যে, বিরোধী দলের প্রতি মানুষের সমর্থন বাড়ছে। তা এ কারণে যে, সরকার আর সরকারদলীয় লোকেরা এমন সব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন, মানুষ তাঁদের ওপর বিরক্ত হতে বাধ্য। সরকারের সাংসদ যদি এলাকায় একই পদে নিয়োগের নাম করে এলাকার অনেক মানুষের কাছে টাকা গ্রহণ করে থাকেন, তাতে সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়বে? সরকার যখন বিচারের রায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত খুনিকে শুধু দলীয় পরিচয়ের কারণে মাফ করে দেয়, তখন দেশের মানুষ খুশি হয়? অর্থনীতির অবস্থা খারাপ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নয়, দলীয়করণ ব্যাপক, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেউ রা-টি করে না। শেয়ারবাজারে ধসের জন্যে যাদের দায়ী করা হয়েছে, তাদের মাথার ওপর থেকে স্নেহের ছায়াটি সরানো হলো না।

মানুষ সরকারের ওপর বিরক্ত। তার মানে এই নয় যে তারা এর আগের বারের সরকারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু দেশের মানুষের ভাগ্য তো টেনিস বলের মতো, তারা একবার এর কোর্টে, আরেকবার ওর কোর্টে যাচ্ছে ব্যাটের বাড়ি খেয়ে।

এই অবস্থায় মানুষ চুপচাপ নির্বাচনের দিনটার জন্য অপেক্ষা করে। ২০০১-২০০৬-এর বিএনপি-জামায়াতের অশাসনের সময় তা-ই করেছিল মানুষ। সেটা বুঝেই ওই সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটিকে হাইজ্যাক করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। শেষ রক্ষা তাতে হয়নি। এই সরকারও উচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায় বেরোনোর আগেই সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করেছে।

মূল গোলযোগটা ওখানেই।

কাজেই 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাতেই ফিরে যেতে হবে। 'নিজের দুটি চরণ ঢাকো তবে, ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।' সরকারকে সারা দেশের যানবাহন বন্ধ করতে হবে না, নিজের মন্ত্রী-এমপি-নেতা-ক্যাডারদের দুর্নীতি-বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে হবে, মন্ত্রিসভার অদক্ষতা দূর করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে বিরোধী দলের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতেই হবে। এবং সেটা হতে পারে উচ্চ আদালতের রায়ের আলোকেই।

শেখ হাসিনার সরকার মনে করে, পত্রপত্রিকায় খবরও বেরিয়েছে, এই মর্মে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে যে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সেই সময়ের সরকারের কেউ কেউ জড়িত। প্রশ্ন হলো, যারা শেখ হাসিনাকে প্রাণে মেরে ফেলতে চায়, তাদের সঙ্গে কোনো রকমের সমঝোতা আদৌ সম্ভব কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না? এইখানেই আসে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিষয়টি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটকের পর হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার পরও কি বঙ্গবন্ধু আলোচনায় বসেননি, নির্বাচনে যাননি?

যারা শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা করেছে, তাদের বিচার করুন, শাস্তি দিন। তাদের মুখোশ উন্মোচন করুন। জনগণই তাদের বয়কট করবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতি গণতান্ত্রিকভাবেই চলতে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পলিটিকস ইজ দি আর্ট অব কম্প্রোমাইজ।

১২ মার্চের বিরোধী দলের মহাসমাবেশকে আশাতীত সাফল্যদানের জন্য সরকারকে আরেকবার অভিনন্দন জানাই।

শেষ করি জুতা আবিষ্কারের চারটি লাইন দিয়ে :

'কহিল রাজা, এত কি হবে সিধে
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশ-শুদ্ধ,
মন্ত্রী কহে, বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।'

২০-০৩-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু কথা বলো যদি...

'দু কথা বলো যদি "প্রিয়" বা "প্রিয়তম", তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না'–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রায় সব কাগজে এবং সব টেলিভিশনের খবরে এই বিষয়টা এসেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া একই অনুষ্ঠানে গেলেন, কিন্তু তাঁদের দেখা হলো না। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে দুজনেই গিয়েছিলেন, কেন তাঁরা সৌজন্য বিনিময় করলেন না, এই নিয়ে কাগজে ও টেলিভিশনে টক-মিষ্টি কথা চালাচালি হচ্ছে। একটা মত শুনলাম, টেলিভিশনে আওয়ামী লীগের এক তরুণ নেতা বলছেন, তিনি ব্যাপারটাকে এত সরল করে দেখেন না। ধরা যাক, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার দেখা হলো, তাঁরা হাসি ও সালাম বিনিময় করলেন, কুশল বিনিময় হলো, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবির জন্য পোজ দিলেন, তাতে কী ক্ষতি-বৃদ্ধি হতো বাংলাদেশের রাজনীতিতে?

আওয়ামী লীগের তরুণ নেতার এই প্রশ্নটা আমাকে ভাবাচ্ছে! সত্যিই কি কিছু এসে যেত? নাকি কিছুই আসে-যায় না?

পাশাপাশি আরেকটা প্রশ্ন মাথার মধ্যে কিলবিল করছে, যেটা প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যায় (২৩ নভেম্বর, ২০১২) ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের প্রবন্ধ 'বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র নয় কেন?' থেকে মাথায় এসেছে। তিনি বলছেন, ব্যর্থ রাষ্ট্রের একটা উপাদান আমাদের দেশে অনুপস্থিত। তাহলো, 'বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ কিংবা অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে সৃষ্ট সশস্ত্র সংঘাত।' যাক বাবা, বাঁচা গেল। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ থেকেই জানছি, ফরেন পলিসি সাময়িকী যে ১২টি সূচক দিয়ে ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকা তৈরি করে, তার একটি হলো, 'বিবদমান গোষ্ঠীর অসন্তোষ ও প্রতিশোধস্পৃহা। অন্য সব সূচকের তুলনায় এই বিশেষ সূচকটিতেই বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ–অনেকটাই সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোর সমপর্যায়ে।' আফ্রিকার অনেক দেশে জাতিগত বা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব আছে, দুটো আলাদা জাতি বা গোষ্ঠী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং রাষ্ট্রকে ব্যর্থতার চোরাবালিতে তলিয়ে দিতে থাকে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতটা এত তীব্র, এত অনিরাময়যোগ্য হয়ে উঠল কেন? হয়তো একই বাড়ির দুই ছেলে, রাতে একই বিছানায় এসে ঘুমায়, একজন আওয়ামী লীগ করে, আরেকজন বিএনপি, তাদের বাবা এক, হাঁড়ি এক, ধর্ম এক, নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় এক, তারপরও তারা কেন কেউ কারও মুখ দেখতে চায় না? রাস্তায় যখন মারামারি বাধে, তখন একজনকে পেটাতে বা কোপাতে আরেকজনের হাত কাঁপে না?

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ লিখেছেন, 'অস্ত্রধারীদের আধিপত্যের নিরিখে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোকে মাঝেমধ্যে একেকটি সোমালিয়া বলে মনে হতেই পারে।' সেখানে বিএনপি-আওয়ামী লীগ বা জামায়াতের দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু কী ব্যাখ্যা দেবেন, যখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা দল বেঁধে কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের ছেলেদের ওপর চড়াও হয়, ক্যাম্পাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটা কোন দ্বন্দ্ব? কিছুদিন আগে টেলিভিশনের পর্দায় একটা যুদ্ধ দেখলাম, ময়মনসিংহ এলাকার গ্রামের দৃশ্য। দুটো গ্রামের লোকজন ধানখেতের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, দুই পক্ষেই হাজার হাজার মানুষ, তাদের হাতে যা কিছু আছে তা, মধ্যখানে কয়েকজন পুলিশ অসহায়ভাবে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ছে। বাংলাদেশে সংঘাতে মাততে কোনো জাতিগত দ্বন্দ্ব লাগে? আমরা কলেজে কলেজে মারামারি করি, গ্রামে গ্রামে মারামারি করি, আর আমার রংপুর শহরে দেখেছি পাড়ায় পাড়ায় মারামারি লাগত, এক পাড়ার ছেলে আরেক পাড়ায় গেলেই ক্ষুর দিয়ে পিঠ কেটে দেয়া হতো। আমার কাছে এসবের কোনো ব্যাখ্যা নেই, শুধু এতটুকুন বলতে পারি, আমরা এখনো যথেষ্ট সভ্য হইনি, আদিম সমাজের মধ্যে যে টোটেম প্রথা, সেইটা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়ে গেছে, কাজেই আমরা বিভেদের জন্য অছিলা খুঁজতে থাকি, কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ পেলেই আমরা দল বেঁধে লড়াইয়ে নেমে পড়তে পারি। এই দেশে রামুর মতো ঘটনা ঘটানো তাই খুবই সহজ। আমরা আসলে বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছি।

এখন আসি শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার কুশল বিনিময় প্রসঙ্গে। অন্য আর সবার মতো আমিও এই কথা বলে এসেছি যে বাংলাদেশে দুই বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিই এই দেশের প্রধান দুটো ধারা, জগৎ সব সময়ই দুই চাকায় চলতে পছন্দ করে। এই রকম দুটো দল যুক্তরাষ্ট্রে আছে, যুক্তরাজ্যে আছে, বাংলাদেশেও আছে। এদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য আছে, জন্মের ইতিহাসের পার্থক্য আছে। কিন্তু সেই পার্থক্য কমেও আসছে। গত কয়েক দিনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বড় পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালেদা জিয়া ভারত সফর করে এসেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কোনো তৎপরতা তিনিও চলতে দেবেন না। তিনি রামু সফর করেছেন। আওয়ামী লীগকে অভিযুক্ত করেছেন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা মুখে বলে কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত কাজ করার জন্য। তিনি একটা নির্দেশও পার্টির কর্মীদের মধ্যে জারি করেছেন, তাহলো, বিএনপির কর্মীরা যেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে থাকে, তাদের পক্ষে থাকে। এবং আরেকটা কথাও শোনা যাচ্ছে, বিএনপি বলে আবার বলে না যে যুদ্ধাপরাধীদের প্রকৃত অপরাধের দায় বিএনপি নেবে না। যদি সত্যি সত্যি বিএনপি এই তিনটা ক্ষেত্রে তাদের নীতির এই উদারীকরণ ঘটাতে পারে, তাহলে আমি বলব, তিনটা ছোট্ট পদক্ষেপ, কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিশাল ঐতিহাসিক অগ্রগতি।

তাহলে বিএনপি আর আওয়ামী লীগের পার্থক্য কোথায়? দুই দলই বিশ্বাস করে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে, বহুদলীয় গণতন্ত্রে। দুই দলই প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। দুই দলই অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে। তাদের আদর্শ এক। আর তারা দেখতেও এক। তাদের ভাষা এক। তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এক। তারা এতই এক যে নির্বাচনের আগে তারা বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে আবার আওয়ামী লীগ ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিতে পারে, যদি মনোনয়ন পাওয়া যায়। তাহলে এত মারামারি কী নিয়ে?

শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়ার হাসি বিনিময় ও মোলাকাতের মধ্যে একটা বাস্তব কাঁটাতারের বেড়া আছে। আর তাহলো একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা। আমার মনে হয়, শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন, একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলার জন্য তৎকালীন সরকার বা ক্ষমতাকেন্দ্র দায়ী। যাঁরা আপনাকে হত্যা করার জন্য গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ফেলেছেন, তাঁদের সঙ্গে বা তাঁদের নেতার সঙ্গে আপনি হাসিমুখে কথা বলবেন কী করে? হয়তো শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের জন্য অংশত জিয়াউর রহমানকে দায়ী ভাবেন। এবং খালেদা জিয়া হয়তো জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পেছনে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ভূমিকা আছে বলে মনে করেন। যে কারণে শেখ হাসিনা কোনো দিনও বিএনপিকে মেনে নিতে পারেননি আর এরশাদ সাহেবের সঙ্গে বিএনপির মিলন হতে হতেও হয় না।

কিন্তু ওপরতলার এই দ্বন্দ্ব মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে এভাবে ছড়িয়ে গেল কেন? এই রকম দ্বন্দ্ব নিয়ে কি একটা জাতি এগোতে পারে? আর এই দ্বন্দ্ব যখন হরতাল-ভাঙচুরে রূপ নিয়ে জনজীবনকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যাহত করে, অর্থনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মকাণ্ডকে স্থবির করে, তখন সেটা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি আমাদের অন্বেষণ করতে হবে না?

আমাদের সংঘাতমুখর রাজনীতিতে আরেকটা সংঘাত এসে রক্তক্ষয় ঘটাতে শুরু করেছে। তাহলো জামায়াত-শিবিরের কর্মকাণ্ড। যুদ্ধাপরাধের বিচারের কাজ যতই এগোচ্ছে, জামায়াত-শিবির ততই যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠেছে। সরকার ভবিষ্যতে এটা কীভাবে সামলাবে? এই দ্বন্দ্বকে খবরের কাগজের শিরোনাম করে রাখতে পারলে শেয়ার মার্কেট কিংবা হল-মার্ক কেলেঙ্কারি বা পদ্মা সেতু দুর্নীতির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যাবে, নীতিনির্ধারকদের মাথায় কি এ ধরনের সর্বনাশা চিন্তা উঁকি দেয়? তাহলে এর চেয়ে বড় ভুল আর কিছুই হবে না। কারণ, দেশের মানুষ সবার আগে চায় শান্তি। সরকারকে অবশ্যই নিরাপত্তার আশ্বাসে জনগণকে আশ্বস্ত করতে হবে। রাস্তায় রাস্তায় মারামারি হবে, পুলিশ মার খাবে, আর জনগণ সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়বে, এই অঙ্ক যদি কেউ করে থাকেন, তাহলে ভুল করবেন।

যুদ্ধাপরাধের বিচার হোক, এটা জনগণের দাবি। আর দেশে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত থাকুক, এটা জনগণের অন্তরের চাওয়া। এই দেশের সব জনগণের চিরকালের মৌলিক চাওয়া। সেটা সরকারকে দিতে হবে।

আর সে জন্যই কৌশলের অংশ হিসেবে হলেও শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার কুশল বিনিময় করা দরকার। দেশের মানুষের মধ্যে এত সংঘাত ভালো নয়! রাস্তায় মারামারি করে বিএনপি-আওয়ামী লীগ ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে ফেলবে, এই রকম তো হবে না। আর আমরা উভয় দলের মধ্যে তো একটা বিষয়ে মতৈক্য দেখি। লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, দেশের টাকা বাইরে পাচার ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, বরং প্রতিযোগিতা আছে, কে কত বেশি করে দেখাতে পারে। কিন্তু হওয়া উচিত এর উল্টো। উভয় পক্ষই যদি লোভের ঊর্ধ্বে উঠতে পারত, সবকিছুকে কুক্ষিগত করার নীতি বর্জন করতে পারত, বিরোধী দল ও মত দমন না করত, তাহলে ক্ষমতা হারানোর ক্ষতিটা সহনীয় পর্যায়ে থাকত, ক্ষমতার জন্য দলগুলো এই রকম মরিয়া হয়ে উঠত না।

আমরা জানি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে কত সৌজন্য দেখাতেন। তাদের পরিবারের খোঁজখবর নিতেন, পরিবারগুলোকে সাহায্যও করতেন। আমাদের রাজনীতিতে একটা সময় পর্যন্ত ভদ্রতা, সৌজন্য, নাগরিক সুরুচির ব্যাপারটা ভালোভাবেই বলবৎ ছিল। দিন দিন আমরা খারাপের দিকেই যাচ্ছি।

কিন্তু আমাদের আসলে ঐক্যের সূত্রগুলোই খুঁজতে হবে, ঐক্যের জমিন নির্মাণ করতে হবে। প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলেই জাতীয় মতৈক্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠিত হবে–এই কৌশল কেবল ভুলই নয়, আত্মঘাতী ও দেশধ্বংসী। বাংলাদেশের মানুষ কাউকেই চিরকালের জন্য ক্ষমতার মৌরসি পাট্টা দিয়ে দিতে চায় না।

দুটো বিবদমান দলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য এখন কম। এখন দরকার মানুষকে সেবা দেয়া, ঘোষিত অঙ্গীকারগুলো পূরণ করা। মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নত করা। সুশাসন দেয়া। দুর্নীতি না করা। মানুষকে শান্তিতে ঘুমোতে দেয়া। দ্বন্দ্বের বদলে শান্তির জমিন রচনা করা। তা করার জন্য যেকোনো উপলক্ষকেই কাজে লাগানো উচিত, আর তা যদি হাসিনা-খালেদার করমর্দন ও হাসি বিনিময়ও হয়, হতে পারে।

কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এখানেও আমাদের প্রত্যাশা অপূর্ণই থেকে গেল!

২২-০৩-২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরাই চ্যাম্পিয়ন...

২৬ মার্চ ২০১২ এই লেখাটি লিখছি–স্বাধীনতার ৪১-তম বার্ষিকীর দিনটিতে। কী সুন্দর আলোকিত দিন! আমার এক চিলতে বারান্দায় সামনের ভবনের ফাঁক গলেও নাছোড় রোদ এসে পড়েছে। টবের সবুজ পাতায় পাতায় আলোর নাচন। ভালো লাগার এক স্নিগ্ধ অনুভূতিতে মনটা ভরে আছে।

আমি কম্পিউটারে লিখি। আমার ল্যাপটপ খুলতেই ওয়ালপেপারে সেই ছবিটা। সাকিব আল হাসানের বুকে মুশফিক আর নাসির। সাকিব দূরে তাকিয়ে কান্না চাপার চেষ্টা করছেন। তাঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু এ ছবির দিকে তাকিয়ে কোনো দীর্ঘশ্বাস আমার বুক থেকে বেরিয়ে এল না। বরং একটা বিজয়ের গৌরব আমার অনুভূতিজুড়ে।

ফাইনাল খেলার দিন সকালে প্রথম আলোর মুদ্রণহীন সংস্করণে একটা লেখা লিখেছিলাম; 'আমরা যেভাবে চ্যাম্পিয়ন হতে পারি'। তাতে বলেছিলাম, ক্রিকেট খুব অনিশ্চিত খেলা। জয়-পরাজয় আমাদের হাতে নেই। কিন্তু আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারি সুখেলোয়াড়সুলভ আচরণ করে, স্বাগতিক হিসেবে অতিথিদের সঙ্গে মহত্তম আচরণ করে। ফলের প্রতিক্রিয়া সুন্দরভাবে প্রকাশ করার মাধ্যমে।

আমি খেলা দেখেছি যে গ্যালারিতে, সেখানেই ছিলেন পাকিস্তান থেকে আগত সেই ভদ্রলোক, যাঁর উচ্চতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের রহমতের মতো, গোঁফ দুটো দশাসই। তিনি পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে একটা বিকট ঢাক পেটাতে থাকেন। এর আগেও তাঁকে দেখেছি। তিনি এর আগে ঢাক পেটাতেন হাত দিয়ে। ফাইনাল খেলার দিন একটা বোতল দিয়ে এমনভাবে ঢাক বাজাচ্ছিলেন যে সেটা কর্ণপীড়ারই সৃষ্টি করছিল। একজন-দুজন দর্শক তাঁকে বললেন, 'আপনি বোতল দিয়ে নয়, হাত দিয়ে বাজান। গ্যালারিতে বোতল নেয়া তো নিষেধ।' তিনি শুনলেন না। খেলা তখন শ্বাসরোধকারী উত্তেজনায় চলে গেছে। শেষ ওভার। চারদিকে নীরবতা। এর মধ্যে বাংলাদেশের উইকেট পড়তেই তাঁর ঢাক আবারও গর্জে উঠল। একজন দর্শক খেপে গেলেন। 'এই মিয়া, তোমারে যে কইছি বোতল দিয়া বাজাইবা না, কথা শোনো না কেন?' তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলার যে অবস্থা, তাতে ওই ভদ্রলোকের গায়ে হাত পড়তে পারত। কিন্তু বিস্ময়করভাবে সবাই নিবৃত্ত করল ওই উত্তেজিত বাংলাদেশ সমর্থকটিকে এবং অন্তত ১০ জন স্যরি বলল ওই পাকিস্তানি ব্যক্তিটিকে। এই যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, এই যে ঔদার্য, এই যে আতিথেয়তা–এটাই তো একটা দেশকে চ্যাম্পিয়ন করে তোলে। ইংল্যান্ডের মাটিতে যখন খেলা হয়, তখন ভারতীয় বংশোদ্ভূতেরা ভারতকে, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতেরা বাংলাদেশকে সমর্থন করে। এই নিয়ে কোনো সমালোচনা হয় না। বাংলাদেশে ভিনদেশিরা আসবেন, তাঁরা নিজের দেশের দলকে সমর্থন জানাবেন। আমরা তাঁদের বাঙালির ঐতিহ্যবাহী আতিথেয়তা দেখাব। এতেই তো আমাদের গৌরব বাড়বে।

কিন্তু বহু ব্যাপারে আমাদের আচরণ একটু আদিম সমাজের মতো। রাস্তায় কোনো গাড়ি যদি দুর্ঘটনা ঘটায়, আমরা সেই গাড়ি তো ভাঙচুর করিই, এরপর যত গাড়ি সামনে পাই, তাতেও হামলে পড়ি। এই তো সেদিন ডাকাত সন্দেহে আমিনবাজারের কাছে কয়েকজন ছাত্রকে মেরে ফেলা হয়েছে গণপিটুনিতে। সাধারণ মানুষ এই রকম তো করেই, আমাদের রাষ্ট্রও অনেক সময় এসব অনুমোদন করে। 'ক্রসফায়ারে'র নামে এই দেশে বিনা বিচারে মানুষ মেরে ফেলা হয়। সেই দেশে ক্রিকেটে হারলে প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, আমরা জানি না। শুধু কি হারলে প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক? জিতলেও হয়। আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ি। রাস্তাঘাট বন্ধ করে গাড়ির ওপর উঠে লাফাতে থাকি। গাড়ি ভাঙচুর হয়। রং নিয়ে রাস্তায় নামি এবং নির্বিচারে রং ছুঁড়তে থাকি। আর মেয়েদের রাস্তায় দেখলে তাদের অপমানিত করাটা যেন বিজয়ীর বৈধ অধিকার বলে কখনো-সখনো ভেবে নিই। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে জেতার পরও আমি স্টেডিয়াম থেকে বের হওয়ার পথে বিপন্ন বোধ করেছিলাম। আমাকে হাবিবুল বাশার বললেন, তিনিও তাঁর গাড়ি নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। আমাদের এক নারী সহকর্মী স্বামীসহ স্টেডিয়াম থেকে ফেরার পথে রং তো খেয়েইছেন, খুব বিপন্ন বোধ করে শেষে একটা টেলিভিশনের গাড়িতে আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন।

জাতি হিসেবে আমাদের আরেকটু পরিপক্ব হতে হবে। আরেকটু শৃঙ্খলা, ভব্যতার চর্চা করতে হবে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো যোগ্যতা ও পরিপক্বতার পরিচয় দিতে হবে।

২২ মার্চের ফাইনালে আসলে আমরা সেই পরীক্ষাতেই পাস করেছি। দুই রান তো কোনো ব্যাপারই নয়। এটা যেকোনোভাবেই হতে পারত। নাজমুল যদি আহত না হতেন, তাহলে তিনি আরও দুই ওভার বেশি বল করতে পারতেন। তাহলে পাকিস্তানের রান হয়তো ১০-১৫টা কম হতো। মুশকিকের ছক্কাটা হয়ে যেতে পারত, শেষ দুই বলে একটা চার হওয়া অসম্ভব কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তা হয়নি। তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক ডন পর্যন্ত লিখেছে, পাকিস্তান এশিয়া কাপ জিতল আর বাংলাদেশ জিতল হৃদয়।

আর সাকিব আল হাসান, মুশফিকদের কান্নার সঙ্গে কেঁদেছে পুরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ। সেই অশ্রুতে কোনো মালিন্য ছিল না। পরাজয়ের গ্লানি ছিল না। আমাদের ক্রিকেট পুরো জাতিকে একটা সূত্রে গ্রথিত করেছে–তা হলো, আমরা ১৬ কোটি মানুষ বাংলাদেশের জয় চাই। প্রশ্ন যখন দেশের জয়-পরাজয় নিয়ে, তখন আমরা সবাই এক, আমাদের সবার হৃদয়ের চাওয়া অভিন্ন। সাবাস, মুশফিক, সাকিব, তামিম, মাশরাফি, নাসির। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

এই দিনে আমার মনে পড়ছে আরেক জনের কথা। ১৯৭১ সালে তিনিও ছিলেন এদেরই মতো বাচ্চা ছেলে, মাত্র একুশ বছরের। তাঁর নাম আবদুল হালিম চৌধুরী। ডাকনাম জুয়েল। পূর্ব পাকিস্তান ক্রিকেট দলের উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান ছিলেন। ওই সময় যা দেখা যেত না, তা-ই করতেন জুয়েল। তিনি ছিলেন স্ট্রোক খেলোয়াড়, বল সীমানা পার করাতেন দেদারসে। মোহামেডানে খেলতেন, আগে খেলেছেন আজাদ বয়েজে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনা ট্যাংক-কামান নিয়ে নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বস্তি পোড়ায়, ছাত্রাবাসে হামলা করে, ইপিআর আর পুলিশের ঘাঁটিতে কামান দাগে, যাকে সামনে পায় তাকেই গুলি করতে থাকে। ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রদের ধরে এনে কাতারবন্দী করে গুলি করে। সেই অসংখ্য শহীদের একজন হচ্ছেন ক্রিকেট-সংগঠক মুশতাক; তিনি ছিলেন আজাদ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। এখনকার এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলের কর্মকর্তা সৈয়দ আশরাফুল হক আমাকে বলেছেন, ২৭ মার্চ দুপুরের দিকে তিনি আর জুয়েল মুশতাক ভাইয়ের লাশ দেখতে যান ঢাকা জেলা ক্রীড়া পরিষদ ভবনের সামনে। গিয়ে দেখেন, দুই দিনের বাসি মৃতদেহটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে, হাত দুটো ওপরে ধরা।

সেদিনই জুয়েল প্রতিজ্ঞা করেন, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে সীমান্ত পাড়ি দেন। আগরতলা থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে ঢাকায় গেরিলা অপারেশনে যোগ দেন। যে হাতে ব্যাট চালাতেন, সেই হাতে তুলে নেন আগ্নেয়াস্ত্র। অনেকগুলো সফল অভিযান পরিচালনা করেন তাঁরা। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন অপারেশনে জুয়েলের হাতে গুলি লাগে। তিনি ঢাকায় মগবাজার এলাকায় হাবিবুল আলমের (বীর প্রতীক) বাসায় থেকে হাতের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট ঢাকার অনেক মুক্তিযোদ্ধা শেল্টারে হামলা করে পাকিস্তানি সেনারা। ওই দিন জুয়েলরা ছিলেন আজাদের বাসায়, যে আজাদ মা বইয়ের প্রধান চরিত্র। আজাদদের মগবাজারের বাড়ি থেকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে নিয়ে যায় জুয়েল, আজাদসহ অনেককে। জুয়েল কিংবা আজাদ, রুমী কিংবা বদি–কেউ আর ফিরে আসেননি।

জুয়েল আর মুশতাকের স্মরণে বিজয় দিবসে শহীদ জুয়েল একাদশ বনাম শহীদ মুশতাক একাদশ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হয়। আর জুয়েলের নামে মিরপুর স্টেডিয়ামে গ্যালারি আছে শহীদ জুয়েল স্ট্যান্ড নামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধে যারা যোগ দিয়েছিল, তারা ছিল এমনি তরুণ, কিশোর। জাহানারা ইমামের ছেলে রুমী কেবল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্রগুলোতে আমরা দেখি, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কিশোর যোদ্ধা ছিল অনেক আর ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের পায়ে জুতো ছিল না। পরনের কাপড় মলিন।

অনেক রক্তের দামে আমরা ৪১ বছর আগে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম।

২৬ মার্চ ২০১২-এর প্রথম আলোর প্রধান খবরটা বলছে, 'বাংলাদেশ এখন অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ'। আমাদের গড় আয়ু বেড়েছে, ৯০ ভাগের বেশি ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়, মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে, দারিদ্র্য কমেছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে এবং মানব উন্নয়ন সূচকের অনেকটাতেই আমরা ভালো করছি। ১৯৭১ সালে মার্কিনিরা বলেছিল, বাংলাদেশ নামের দেশটা টিকবে না ('ভায়াবল') হবে না। ৪০ বছরে আমরা কেবল টিকে আছি তা-ই নয়, আমরা ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে প্রমাণ করেছি, স্বাধীনতাই হলো সেই বীজমন্ত্র, যা আমাদের টিকিয়ে রেখেছে, যা আমাদের ক্রমাগত এগিয়ে নিচ্ছে।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মার্চে পাকিস্তান ক্রিকেট দলে একজন মাত্র বাঙালি ক্রিকেটার খেলেছিলেন, তিনি রকিবুল হাসান। জুয়েল বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, আমি খেলব স্বাধীন বাংলাদেশ দলের হয়ে।' আজকে জুয়েল নেই, কিন্তু একটা আইসিসির পূর্ণ সদস্য দল আছে, যেখানে ১১ জন বাঙালি ক্রিকেট খেলেন, যাঁদের কাছে ভারত, শ্রীলঙ্কা পরাজিত হয়, পাকিস্তানও যাদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে ভাবে, 'আমরা কি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলছি?'

শহীদ জুয়েলের ব্যাট আজ মুশফিক-তামিমদের হাতে।

আমরা বিদেশি ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ওপর গুলিবর্ষণ করি না, আমরা শচীন টেন্ডুলকারের শততম শতকের সময়ে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করি। শাকিব-মুশফিকদের অশ্রুর সঙ্গে মিশে যায় আমাদের প্রত্যেকের অশ্রু।

আর ক্রিকেট দলের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়ায় একজনের আত্মহত্যা, আরেকজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে মুশফিকুর রহমান কী সুন্দর বিবৃতিটাই না দিলেন। কী চমৎকার দায়িত্বশীলতার পরিচয়ই না পেলাম আমাদের অধিনায়কের কাছে।

আমরাই তো চ্যাম্পিয়ন।

জাতি হিসেবে আমাদের সাফল্যের ধারা যদি অব্যাহত থাকে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, সভ্যতায়-ভব্যতায়, আচার-ব্যবহার-সুশৃঙ্খলায় আমরা জাতি এগিয়ে যেতে থাকি, ক্রিকেটে কেবল এশিয়া কাপে নয়, বিশ্বকাপেও আমরাই হব চ্যাম্পিয়ন।

আজ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের উজ্জ্বল দিনটি আমাদের সেই সুন্দর আগামীর আগমনবার্তাই যেন জানান দিচ্ছে।

০৩-০৪-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাই খাই তন্ত্রের কালে মুস্তাক-হযরত আলী

মেঘ দেখব, নাকি মেঘের কিনার ঘেঁষে যে রুপালি রেখা দেখা যাচ্ছে, সেটাকেই গুরুত্ব দেব। সেই যে সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সংলাপ ছিল, বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, সেই মেঘ আজও গেল না। এত ব্যর্থতা, এত দুঃসংবাদ, এত হতাশা চারদিকে। হুমায়ুন আজাদের ভাষায় বলতে হয়, এখন প্রকৃত আশাবাদীর পক্ষে আর কিছুই সম্ভব নয়, কেবল হতাশ হওয়া ছাড়া।

হতাশার কারণ কিন্তু উচ্চপর্যায়ে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে। আচ্ছা বলুন তো, একটা মানুষের জীবনে কত টাকা লাগে? যিনি ব্যবসায়ী, তিনি তাঁর ব্যবসা বাড়ানোর চেষ্টা করবেন, শিল্পপতি নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এ খুবই স্বাভাবিক, তা অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করবে, দেশে উৎপাদন বাড়াবে, কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতার কত টাকা লাগে? ৭০ কিংবা ৮০ বছর যাঁর বয়স, তাঁর কেন দরকার হয় নতুন ব্যাংক? যাঁর একটা আঙুলের নির্দেশে হাজার মানুষ জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তাঁকে কেন কমিশন খেতে হয়। কেন আমাদের একজন এমপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে চাকরি দেয়ার নাম করে নিজ নির্বাচনী এলাকার যুবকদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার? কেন এমপিরা স্কুলে বাচ্চা ভর্তি করার বিনিময়ে টাকা নেন? আমাদের সাবেক বা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কি দাবি করতে পারবেন, তাঁর মন্ত্রিপরিষদে এমন কেউ নেই, যে দুর্নীতি করে, একজনও নেই যে ঘুষ খায় (দুঃখিত, কমিশন খায়)। জাতি হিসেবে আমাদের মাথা কতটা নিচু হয়ে আসে, যখন বিদেশে আমাদের প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত হয় এবং দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে সংবাদপত্রে শিরোনাম ছাপা হয়। আর কী হলে বলা হবে, আমাদের মানসম্মান গেছে!

কিন্তু দুর্নীতি নিয়ে কেউ কথা বলে না। বিরোধী দলও বলে না। কারণ সব রসুনের গোড়া যে একই। আজকে বিরোধী দল যে আন্দোলন করছে, তা ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আন্দোলন–যত লুটপাট আর চোটপাট তো সরকারি দল একাই করে ফেলল। আমাদের ভাগ কই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ অবস্থায় আমরা একেকটা মেয়াদে ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপিত হচ্ছি।

এখন চুলায় আমরা ভালোই পুড়ছি, সামনে আরও বড় অগ্নিকুণ্ড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, জ্বলেপুড়ে শেষ হওয়া ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই।

লুটপাটের এ কোন অভয়ারণ্যে এসে পড়লাম আমরা? এ কোন জতুগৃহে আমাদের বসবাস? আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

সত্যি, একটা মানুষের খাই কত বড় হতে পারে! তলস্তয়ের গল্পে পড়েছিলাম, একজনকে বলা হয়েছিল, এক দিনে যতটা জমি সে হাঁটতে পারবে, ততটাই তার হয়ে যাবে। সারা দিন লোকটা পাগলের মতো ছুটল, যতটা পারা যায় সে হাঁটবে, যত বেশি জমি পারা যায় সে দখল করবে, ছুটতে ছুটতে সূর্যাস্তের সময় লোকটা ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। ভৃত্য তার জন্য সমাধি খনন করল, শেষ পর্যন্ত লম্বায় ছয় ফুট মাত্র জায়গা তাঁর লেগেছিল।

আমাদের নেতাদের কত খেতে হবে? কত খাওয়া হলে তাঁরা বলবেন, বেশ তো খেলুম। কত টাকা তাঁদের চাই। অথচ এঁরা নেতা হয়েছেন নিজের সেবা করার জন্য নয়, দেশের সেবা করার জন্য, জনগণের সেবা করার জন্য। এই হলো দেশসেবার নমুনা!

নিশ্চয়ই সব নেতা দুর্নীতিবাজ নন। নিশ্চয়ই সব মন্ত্রী ঘুষ খান না। কিন্তু যখন এই আমলে কিংবা ওই আমলে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বিদেশি দূত বা দাতারা সরাসরি তোলে, তখন লজ্জায়-অপমানে আমাদের মাথা নিচু হয়ে যায়।

এমনি ঘোরতর অন্ধকারে আশার জায়গা কোথায়? সংসার সমুদ্রে সুখ-দুঃখ তরঙ্গের খেলা, আশা যে তার একমাত্র ভেলা।

আশার জায়গা হলো, এ দেশের মানুষ। এ দেশের কৃষক দুর্নীতি করে না, কিন্তু তারা তাদের কঠোর পরিশ্রম আর তুলনাহীন সৃজনশীলতা দিয়ে ১৬ কোটি মানুষের মুখের অন্ন জোগায়। বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মানুষের যে ঘনত্ব, সেই হারে যদি পৃথিবীর সব মানুষকে বসানো হতো, তাহলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে ৭০০ কোটি মানুষ এটে যেত, তার পরেও যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ জমি পড়ে থাকত। আজকে আমেরিকার কৃষককে যদি বলা হয়, পৃথিবীর সব মানুষের মুখে আহার জোগাতে হবে, তার ওপরে যে চাপ পড়ত, তার দেড় গুণ চাপ বাংলাদেশের কৃষক সার্থকতার সঙ্গে বহন করে চলেছে। আমাদের প্রবাসী শ্রমিকেরা, আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকেরা, আমাদের শিল্পোদ্যোক্তারা দারুণ সব কাজ করছেন, আর দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আর লাভের গুড় শীর্ষ খাদকেরা খেয়ে নিচ্ছে, লুটেপুটে খাচ্ছে আর বড় বড় কথা বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটা গল্প পড়েছিলাম ছোটবেলায়। একজন সাধু কাপড়চোপড় পরেন না। মানুষের সমাজে আসার পরেও তাঁকে কাপড় পরানো গেল না। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, চারদিকে এত মানুষ, আপনার লজ্জা করছে না? তিনি বলেছিলেন, মানুষ কই, আমি তো চারদিকে কেবল পশু দেখি।

আজকে তিনি হয়তো বলতে পারতেন, নেতা কই, আমি তো চারদিকে শুধু খাদক দেখি।

আহ্, কী খাই এদের।

লুৎফর রহমান রিটনের ছড়াটা মনে পড়ে, আবদুল হাই, করে খাই খাই, এক্ষুনি খেয়ে বলে কিছু খাই নাই।

বড় বড় সব গাড়ি চড়েন তারা, বেতন যা পান, তাতে ওই গাড়ির তেল কেনার টাকাও তো হওয়ার কথা নয়।

আচ্ছা, এই যে লুট করে পাওয়া কোটি কোটি টাকা, এসব তাঁরা রাখেন কোথায়?

তবু বলি, মেঘ দেখে তোরা করিস নে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে। না-মানুষের এ দেশে প্রকৃত মানুষের উপস্থিতির খবরও আমরা পাঠ করি।

এমনি একটা খবরের জন্ম দিয়েছেন মুস্তাক আহমদ আর তাঁর মামাতো বোন মাহমুদা আক্তার। গত ২৫ মার্চের প্রথম আলোয় ভেতরের পাতায় ছাপা হয়েছে খবরটা। শিরোনাম, এই আমাদের ঢাকা।

খবরে হতাশার কথা আছে, আশার আলোও আছে। হতাশার ব্যাপারটা হলো, মিরপুর প্রগতি সড়কে একজন মানুষ পড়ে আছে রাস্তায়। খানিকটা রক্তাক্ত এবং অচেতন। হয়তো কোনো গাড়ি ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে, কিন্তু কেউই তার উদ্ধারে এগিয়ে আসছে না। কেউ না। আশার কথা হলো, মিরপুর ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্র মুস্তাক আহমদ চাকরির ইন্টারভিউ থেকে ফিরছিলেন মামাতো বোন মাহমুদা আক্তারকে নিয়ে। তাঁদের চোখে পড়ে ওই মানুষটাকে। তাঁরা তাঁর উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। কোনো যানবাহন ওই অচেতন মানুষটাকে বহন করতেও রাজি হচ্ছিল না। জোর করে ট্যাক্সিক্যাবে তুলে তাঁরা তাঁকে হাসপাতালে নেন। পকেটের কাগজ দেখে তাঁর পরিবারের কাছে খবর পাঠান। আর যিনি এভাবে রাস্তায় পড়েছিলেন, তিনি একজন ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব।

আমরা ঢাকাবাসীর নিষ্করুণ নির্লিপ্ততা ও নির্মমতা নিয়ে আহাজারি করতে পারি। কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা, মুস্তাক আর মাহমুদার জন্য আমাদের গৌরব করতে হবে। আমাদের বলতেই হবে যে, পুরো সমাজটা শেষ হয়ে যায়নি, আমাদের মধ্যে মুস্তাক আর মাহমুদারাও আছেন। তেমনিভাবে আমাদের স্যালুট জানাতে হবে হযরত আলীকে। ৬ এপ্রিল মিরপুর চিড়িয়াখানা সড়কের কাছে সকালবেলা হযরত আলী দেখেন, ছিনতাইকারী মোবাইল ফোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিনিয়ে নিচ্ছে প্রাতভ্রমণে বেরোনো দুই নারীর কাছ থেকে। ছিনতাইকারীরা গাড়ি নিয়ে এসেছে। হযরত আলী নিজের জীবন নিয়ে সটকে গেলেই পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। ইট হাতে তেড়ে যান ঘটনার দিকে। আর ছিনতাইকারীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে পাঁজরে গুলিবিদ্ধ হয়ে হযরত আলী মারা যান।

আমি মাঝেমধ্যে চিন্তা করি, আপাদমস্তক দুর্নীতিতে, নিষ্ঠুরতায়, বিবেকহীনতায় নিমজ্জিত এ দেশে সূর্য কেন ওঠে? বৃষ্টি কেন হয়?

এই দেশে সূর্য আলো দেয় মুস্তাক-মাহমুদারা আছেন বলে। হযরত আলীরা এখনো নিস্পৃহতা, নির্লিপ্ততা অর্জন করতে পারেনি বলে।

আসলে এ দেশে বেশির ভাগ মানুষই ভালো। আমাদের সমস্যা ওপরতলায়। যারা দেশটার সাইনবোর্ড, তাদের মধ্যেই আসল সমস্যা। আমাদের সরিষার মধ্যেই ভূত।

কিন্তু গুটিকয়েক মানুষ আমাদের দেশের সমস্ত সম্ভাবনাকে টুঁটি চিপে মেরে ফেলবে, আমাদের ভবিষ্যতের ডানাটাকে ছিঁড়ে ফেলবে টেনেহিঁচড়ে, এ রকমটা কত দিন চলবে। হিতোপদেশে দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত মানুষগুলো নিবৃত্ত হবে, খাই খাই করা মানুষগুলো খাওয়া বন্ধ করবে, তা মনে হয় না। খেতে খেতে গলা পর্যন্ত খাওয়া হয়ে গেলে কি তারা থামবে? নাকি আরও খাবে?

হয়তো, ছয় ফুট জায়গার মধ্যে আশ্রয় নেয়ার পরেই কেবল এদের ক্ষুধা মিটবে।

কিন্তু এত চমৎকার একটা দেশের অসাধারণ মানুষগুলোর এই যে ভালোত্ব, এই যে পরিশ্রম, এই যে সৃজনশীলতা–এরা কি তাকেও খেয়ে ফেলছে না?

ওরে আশা নাই, ওরে আশা শুধু মিছে ছলনা–এই কি আমাদের ললাটলিপি?

মুস্তাক-মাহমুদা, হযরত আলী, আমি আপনাদের কাছে এসে দুহাত পেতেছি। আপনারাই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। আপনারাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন, হয়তো আপনারাই আমাদের উদ্ধার করবেন এই বিপুল বিনাশ থেকে!

১৩-০৪-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে দেশে হরতাল নামের এক জিনিস আছে

হরতাল পলিসি ফর বাংলাদেশ। ব্রিটিশ কাউন্সিল সারা পৃথিবীতেই ইংরেজি মাধ্যমের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিচ্ছে একই সময়ে–সাধারণত যা 'ও-লেভেল' আর 'এ-লেভেল' পরীক্ষা বলে পরিচিত। সারা পৃথিবীর সব দেশের জন্যই তারা একটা পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করেছে। শুধু বাংলাদেশের জন্য তাদের অতিরিক্ত নিয়ম যুক্ত করতে হয়েছে সেই রুটিনে। তাদের রুটিনে লেখা আছে : হরতাল পলিসি ফর বাংলাদেশ।

পলিসিটা বেশ বড়সড়। মোদ্দা কথা হলো, যদি ১২ ঘণ্টা হরতাল হয়, তাহলে দুপুরের পরীক্ষা সন্ধ্যার পরে, আর বিকেলের পরীক্ষা রাত ১২টায় শুরু হবে। আর হরতাল যদি ২৪ ঘণ্টার হয়, তাহলে এবারের পরীক্ষা বাতিল, সামনের বছর জানুয়ারিতে সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

হ্যাঁ, পরীক্ষার দিনে হরতাল ডাকা হয়েছে। হাজারও পরীক্ষার্থী আর তাদের উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরা মধ্যরাতে পরীক্ষার হলে গেছেন। বাচ্চাদের যখন ঘুমের সময়, চোখ রগড়ে তারা তখন পরীক্ষা দিচ্ছিল, আর তাদের অভিভাবকেরা হলের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে বসে হাই তুলছিলেন।

পৃথিবীতে কত দেশ। কতো বিচিত্র ধরনের মানুষ। এর মধ্যে একটা দেশই আছে, যারা নিয়মিতভাবে হরতাল করে। হরতাল জিনিসটা দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। সর্বভারতীয় বন্‌ধ্ আজকাল আর ডাকা হয় বলে আমার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা পশ্চিমবঙ্গে বন্‌ধ্ আহ্বান করে থাকেন। ভারতের একটা-দুটো রাজ্যে বন্‌ধ্ ডাকা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেটা বছরে-দুবছরে এক-আধবার হতে পারে; নিয়মিতভাবে হরতাল, 'লাগাতার হরতাল', 'দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত হরতাল', 'অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত হরতাল'–এসব এই একুশ শতকে পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে অহিংস পথে পরিচালিত করার জন্য হরতাল নামের এই গুজরাটি শব্দটি চালু করেছিলেন। ব্রিটিশরা চলে গেছে, মহাত্মারাও আজকাল আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীতে জন্মান না, কিন্তু হরতাল জিনিসটা পৃথিবীর সব দেশ থেকে উঠে গিয়ে এই বাংলাদেশে এসেই স্থায়ীভাবে গেড়ে বসেছে।

ভূমিকম্প কখন আসবে, পূর্বাভাস দেয়ার যন্ত্র বা প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়নি। আকাশে মেঘ দেখা দিলে ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়া যায়। সমুদ্র উপকূলে জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস সময় থাকতেই দিয়ে দেয়া যায়, লোকজন সরেও যেতে পারে। কিন্তু ওই সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাসের আগমন প্রতিরোধ করা যায় না। হরতাল আমরা প্রতিরোধ করতে পারি না। কিন্তু আমরা এখন শিখে গেছি, বলতে পারি, কবে হরতাল হবে। বিএনপির ৩৩ জন নেতাকে আদালত থেকে কারাগারে পাঠানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে মুঠোফোনে, ফোনে একটা কথাই বলাবলি হয়েছে, হরতালটা কবে, বৃহস্পতিবার, নাকি রোববার? সবাই জানে, হরতাল অনিবার্য। কবে আর কত দিনের জন্য, সকাল-সন্ধ্যা নাকি তারও বেশি, এটাই ছিল প্রশ্ন। হরতালের দিনের চেয়ে হরতালের আগের বিকেলটা বেশি ভয়াবহ। কারণ, বিকেলে গাড়িতে আগুন দেয়া হবে। গাড়িতে দু-চারজন যাত্রী, চালক জীবন্ত দগ্ধ হবেন। এটাও আমাদের জানা। সর্বশেষ হরতালের আগের দিনেও তা-ই হলো। রাত নয়টার দিকে একজন মুঠোফোনে কথা বলছেন, আমি শুনছি, 'না, না, এত রাতে আর গাড়ি পোড়াবে না, টেলিভিশনের খবরগুলো হয়ে গেছে, পত্রিকার সাংবাদিকেরাও এখন রাস্তায় নেই, এত রাতে গাড়ি পোড়ানোর কথা নয়, আপনি নিশ্চিন্তে চলে আসুন।'

কেন্দ্রীয় নেতাদের কারাগারে পাঠানোর আগের ঘটনা ইলিয়াস আলীর গুম হয়ে যাওয়া। এই পর্যায়ের একজন নেতাকে রাজপথ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে ড্রাইভারসমেত, তার গাড়ি পড়ে রইবে রাস্তায়, তার পরও বিরোধী দল চুপচাপ সেটা মেনে নেবে, এটা কেউ ভাবেনি। কাজেই দেশের মানুষ প্রস্তুত হয়েই ছিল, কবে হরতাল, কত দিনের জন্য হরতাল।

দেশের সাধারণ মানুষই বোঝে, কোন্ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় হরতাল আসবে। অথচ সরকার তা জানে না, তা হয় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে উচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায় এখনো প্রকাশিত হয়নি। সেটা হাতে পাওয়ার আগেই তড়িঘড়ি করে সংবিধান কেন সংশোধন করে ফেলা হলো, সেই বিস্ময় আমার যায় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা তুলে দেয়া হলে বিরোধী দলগুলো সেটা মানবে না, কাজেই তারা রাজপথে আন্দোলনে যাবে, সেটা যেকোনো বাচ্চা ছেলেও বোঝে। এই সংশোধনী তো সরকার তার ক্ষমতা-মেয়াদের একেবারে শেষ ভাগেও করতে পারত। তাড়াহুড়াটা কেন?

সরকারের নিশ্চয়ই অনেক সাফল্য আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থতাও আসতে পারে। কিন্তু জেনেশুনে বিষপানের মতো ঘটনা একটার পর একটা কেন সরকার ঘটাচ্ছে, আমি অনেক চিন্তা করেও কোনো সমাধান পাই না। কতগুলো ইস্যু অপ্রয়োজনে তৈরি করে বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। যেসবের কোনো দরকারই ছিল না। ধরা যাক, বিদ্যুৎ-সমস্যার সমাধানে সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে, কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এনে সমস্যার দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করেছে; কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। এটার সাফল্য-ব্যর্থতা এবং তার কারণ নিয়ে আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারি। কিন্তু বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে গাড়িতে আগুন দেয়ার ঢালাও অভিযোগ এনে তাঁদের গ্রেপ্তার করার পরিণতি কী হবে, সেটা কি সরকার বোঝে না? এই সিদ্ধান্তগুলো কে নিচ্ছেন? কীভাবে নিচ্ছেন?

সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রী-এমপির আচরণ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যা প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে আমাদের মাথা হেট হয়ে আসে। কারও পিএস টাকার থলি নিয়ে ধরা পড়েন, কারও বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগ তোলে এবং সব ধরনের লেনদেন বন্ধ করে দেয়। আচ্ছা, পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংক টাকা দেবে না, কাজেই আমরা মালয়েশিয়া থেকে টাকা আনব, তাতে যদি সুদের হার বেশি দিতে হয়, সেই অতিরিক্ত টাকাটা কে দেবে? সরকারের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, সেটা যদি কাল্পনিক আর বানোয়াটও হয়, তার দায় কেন জনগণ নেবে? সেই অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণ করে সহজ শর্তে তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব সরকারের, পাবলিকের নয়।

কোনো এমপির গাড়িতে গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়, কোনো এমপি জনতার উদ্দেশে পিস্তল উঁচিয়ে গুলি ছুঁড়ছেন, সেই ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সরকার ও প্রশাসনের চরম দুর্নীতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী নিজে হতাশা প্রকাশ করেন। সর্বত্র দলীয়করণ, নিয়োগ-বাণিজ্য ও লুটপাট। এমপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ভূমিদস্যুতার। স্কুলে বাচ্চা ভর্তি করানোর বিনিময়ে এমপি টাকা খান, লোক নিয়োগের নাম করে একই পদের বিপরীতে এলাকার একাধিক মানুষের কাছ থেকে টাকা খাওয়ার অভিযোগ ওঠে এমপির বিরুদ্ধে। একদিকে দেশ চালাতে গিয়ে নানা সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতাগুলো যেমন প্রকট হয়ে উঠছে, তেমনি কোনো কোনো মন্ত্রী-এমপি বা পদস্থের আচার-আচরণ সরকার-সমর্থকদের মুখে চুনকালি মেখে দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বিরোধ মোকাবিলায় সরকারের আচরণ অসহিষ্ণু, নিপীড়নমূলক ও অগণতান্ত্রিক। বুঝতাম তা যদি কার্যকর হতো। মানে বলতে চাচ্ছি, দমন-নিপীড়ন করেও যদি সরকার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারত, তবুও না হয় একটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত। তা তো হচ্ছে না। নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এবং সরকারের একেকটা পদক্ষেপে তার জনপ্রিয়তায় একটা করে ধস নামছে।

যখন ব্যর্থতা আসে, তখন এমনি করেই আসে। একটার পর একটা ব্যর্থতার ঢেউ এসে আঘাত আনে। আর স্থানে স্থানে এমন সব কেলেঙ্কারির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনা ঘটে, মুখে চুনকালি পড়তে থাকে। তখন সরকারগুলো মরিয়া হয়ে ওঠে, বাজে বকতে থাকে, দমনপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং ভাবতে থাকে, আমার মতো শক্তিশালী জগতে আর কেউ নেই। আমার মতো জনপ্রিয়ও পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কিন্তু পায়ের নিচের মাটি সরতে থাকে। তারপর যখন সরকারের পতন হয়, তখন সেটা হয় খুবই করুণ, খুবই শোচনীয়।

ইতিহাস পুনরাবৃত্তিময়। ইতিহাসের শিক্ষা হলো, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না।

এর মধ্যে রাজনীতিতে একটা সামান্য আশার আলো ফুটেছে। তা হলো, হরতালের বদলে বিরোধী দলের অনশন কর্মসূচিকে লোকে স্বাগত জানিয়েছে। বিএনপিও বলেছে, তারা হরতাল আহ্বান করতে চায় না। এই ছোট্ট আশাপ্রদ সূত্রটাকে ধরে উভয় পক্ষ কি এগিয়ে যেতে পারে না? সরকারের দিক থেকে সমঝোতার একটা চেষ্টা কি নেয়া যায় না? রাজনৈতিক সমস্যার কোনো পুলিশি সমাধান নেই, আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব এটা না বোঝার মতো বোকা হতেই পারে না। সেখানেই আমাদের সামনে এক রহস্যময় ধাঁধা, রাজনৈতিক বিষয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কি রাজনীতিকেরা নিচ্ছেন, নাকি অরাজনৈতিক কোনো উপদেষ্টা চক্রের হাতে পড়ে গেছে দেশ?

এই কলামের নাম 'অরণ্যে রোদন'। কাজেই আমাকে অরণ্যে রোদন করে যেতেই হবে। রাজনৈতিক সংঘাত নিরসনে এগিয়ে আসুন। আরও দেড় বছর নির্বিঘ্নে দেশ চালনা করে সময়মতো নির্বাচন দিন। হরতাল আসতে পারে, এমন ঘটনা ঘটানো থেকে বিরত থাকুন।

আমি জানি, আমার এই কথা অরণ্যে রোদন মাত্র। একটা ভুল আরেকটা ভুল ডেকে আনে, একটা ভুল ঢাকার জন্য আরও ভুলের সিরিজ ডেকে আনা হয়।

আহা, এই দেশের সৃষ্টিশীল উদ্যমী মানুষগুলোর জন্য আমার কেবল মায়াই হয়, আফসোসই হয়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কত বিরূপ, এর মধ্যেই কৃষকেরা বাম্পার ফসল ফলাচ্ছেন, শ্রমিকেরা-উদ্যোক্তারা-ব্যবসায়ীরা অর্থনীতির চাকা ঘোরাচ্ছেন, প্রবৃদ্ধি অর্জন করছেন। নিশাত মজুমদারেরা এভারেস্টে উঠে বাংলাদেশের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরছেন। আমাদের রাজনীতি যদি একটু মানুষবান্ধব হতো, আমরা কোথায় পৌঁছাতাম।

২৯-০৫-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘা মারো, বাঁচাও

আজ পঁচিশে বৈশাখ। আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী বাংলাদেশে ও ভারতে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে, যৌথভাবেও। ভারত ও বাংলাদেশের অভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আছেন, যিনি বারবার করে বলেছেন, 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ'। প্রতিবেশীর সঙ্গে, এমনকি অপ্রতিবেশীর সঙ্গেও বন্ধুত্বই লাভজনক।

ভারত আর বাংলাদেশের বন্ধুত্বের মধ্যে এখন কাঁটাতারের বেড়া হয়ে আছে অপরিচয়ের দূরত্ব। এ দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বন্ধুত্বের, সুসম্পর্কের যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়, তা মরুপথে হারিয়ে যায়। তার একটা কারণ, অপরিচয়ের সংকট। মানুষে মানুষে যদি যোগাযোগ বাড়ে, আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়, তাহলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বন্ধুত্ব পোক্ত হবে, কার্যকর হবে।

আমরা ভারতকে যত জানি, ভারত আমাদের তত জানে না। আমরা ভারতের ছবি দেখি, টেলিভিশন চ্যানেল দেখি, গান শুনি, কলকাতার লেখকদের লেখা আমাদের মুখস্থ, এমনকি ভারতের ইংরেজি ভাষার লেখকেরা কে কোথায় কী করছেন, আমাদের অজানা নয়। ভারতের বেশির ভাগ মানুষ বাংলাদেশের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না।

এ প্রসঙ্গ উঠেছিল গত ১৭ এপ্রিল প্রথম আলো আর ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে মৈত্রীবন্ধন শীর্ষক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আসাদুজ্জামান নূর যখন কলকাতা টাউন হলে আবৃত্তি করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, তাঁর দলবলসমেত, রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা মিলিয়ে একটা কাব্যালেখ্যর নাটকীয় উপস্থাপনা নিয়ে। আবৃত্তির পরে আলোচনা। আসাদুজ্জামান নূরই প্রসঙ্গটা পাড়লেন। মুম্বাই থেকে কজন তরুণ এসেছিলেন বাংলাদেশে, 'কে হতে চায় কোটিপতি' অনুষ্ঠান নির্মাণের কাজে সহায়তা করতে। তাঁদের নূর নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর বাসভবনে। ওই তরুণদের একজন বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ যে এমন, তা আমাদের ধারণাই ছিল না।' নূর তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বাংলাদেশকে আপনারা কেমন ভেবেছিলেন?' ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ বলেছিলেন, কোনো মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রির মতো। আসাদুজ্জামান নূর কলকাতার টাউন হল মঞ্চে তাই বললেন, কলকাতার চেয়ে ভারতের অন্য রাজ্যে এ ধরনের অনুষ্ঠান বেশি বেশি করা দরকার।

একজন দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে আসাদুজ্জামান নূরের এ বক্তব্য সমর্থন করে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলেন, সাধারণ ভারতীয়রা বাংলাদেশ সম্পর্কে কত কম জানে, বা কত ভুল জানে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অবশ্য সেই দর্শককে বললেন, আপনার অভিজ্ঞতাই শেষ কথা নয়, এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে খুবই আগ্রহ পোষণ করেন, যাঁরা বাংলাদেশের সাহিত্য-শিল্প-নাটকের খোঁজখবর রাখেন। যেমন রুদ্র নিজেই তা করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছিলেন, 'অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে? অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে'। তবু মনে হয়, বাংলাদেশকে কম জানা, বা না জানা দুই দেশের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ভারতের শীর্ষ পর্যায়ে এবং বাংলাদেশের বহু পর্যায়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নত করার জন্য সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, ভারতের আমলাতন্ত্রে উদ্যোগগুলো আটকে যায়। চুক্তি হয়, প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু কার্যকর হয় না। ঋণ দেয়ার কথা ঘোষিত হয়, টাকাটা আসে না।

১৬ এপ্রিল কলকাতার টাউন হল মঞ্চে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও পাঠের আয়োজনে ছিলেন ভারতের নমিতা গোখলে আর বাংলাদেশের সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। আমিও ছিলাম। আমি বললাম, এক দিন আগে পয়লা বৈশাখ সারা বাংলাদেশে কী বিপুলভাবে, কী মহাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে, আপনারা যদি জানতেন! লাখ লাখ মানুষ রাস্তায়। ঢাকা শহরের অলিতে-গলিতে, প্রতিটা পার্কে, রমনায়, ধানমন্ডি লেকের ধারে, চন্দ্রিমা উদ্যানে, মিলনায়তনে, সারা বাংলাদেশের প্রতিটা শহরে কত যে মঞ্চ, কত যে অনুষ্ঠান, আর কোনোটাতেই লোকের কোনো অভাব নেই। আপনারা কলকাতায় বসে এটা কল্পনাও করতে পারবেন না।

আমাদের পয়লা বৈশাখ আমরা সংগ্রাম করে অর্জন করেছি।

যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অর্জন করে নিয়েছি সংগ্রাম করে। ষাটের দশকে যখন রবীন্দ্রনাথের জন্মশত বার্ষিকী পালনে বাধা এল, তখন আমরা সেই বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের করে নিয়েছি, সে জন্য আমাদের রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসা, অশ্রু, স্বেদ আর রক্তের মাধ্যমে অর্জিত রবীন্দ্রনাথ। এর তাৎপর্য ভারতবাসী বুঝবে কি না, আমি জানি না।

কিন্তু আমাদের অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের মধ্যে দূরত্ব দূর করুক। দুই দেশের বন্ধুত্বকে দুই দেশের মানুষের জন্য উপকারের ক্ষেত্র দিক। রবীন্দ্রনাথ মিলনের কথা বলেছেন, এমনকি মুক্তধারা নাটকে সরাসরি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপকার্থে বলেছেন নদীতে বাঁধ দেয়ার ক্ষতির কথা, বলেছেন বাঁধ ভেঙে দেয়ার কথা, সে কথাও আমরা স্মরণ করব–

'বিভূতি : ... আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত : শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও জানে না। তারা বিশ্বাসই করতে পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন, কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।'

প্রকৃতির গতিকে রুদ্ধ করার পরিণতি ভালো হয় না।

ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ঢাকা সফর করলেন। উপলক্ষ এই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' সেই দেয়া-নেয়া উভয়ের ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে, সমমর্যাদার ভিত্তিতে হোক।

একই সময়ে এসেছিলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন।

এটিএন বাংলার সাংবাদিক জ. ই. মামুন হিলারিকে প্রশ্ন করেছিলেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুযোগ চায়–এ রকম অনেক দাবি আছে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছে কী চায়? হিলারি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ দুই গণতান্ত্রিক দেশ, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছে অন্য কিছু চায় না। যুক্তরাষ্ট্র দেখতে চায়, একটা গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভালো করছে, এগিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি।

তিনি আমাদের অতিথি। অতিথির কথার পিঠে আমরা কথা বলি না। আমাদের সংস্কৃতি হলো, অতিথিকে সর্বোচ্চ সম্মান দেখানো।

শুধু মনে পড়ে, পাকিস্তান জন্ম নেয়ার আগেই, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রু ম্যানের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, '১৫ আগস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান রাষ্ট্র বলে একটা নতুন সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, ভারতের উত্তর-পশ্চিমের একটা বড় অংশ আর দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটা ছোট অংশ নিয়ে। ৭৫ মিলিয়ন লোকের পাকিস্তান হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র, আর এটা হবে রণকৌশলের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।'

পাকিস্তানের জন্মের আগেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁরা বন্ধুত্ব করবেন। কারণ, এটা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল-সংক্রান্ত এলাকা।

সেই বন্ধুত্বের পরিণাম কী হয়েছে, আমরা জানি। এখনো পাকিস্তানকে ভুগতে হচ্ছে।

আমেরিকা সারা পৃথিবীতে যেখানেই গেছে, নিজের স্বার্থেই গেছে। তাদের কাছে সন্ত্রাসবাদের একটা মানে আছে, গণতন্ত্র, মানবাধিকারের সংজ্ঞা তারা নিজেদের দেশে নিজেদের নাগরিকদের জন্য যে মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই একই মাপকাঠিতে পৃথিবীর অন্য দেশগুলোতেও পরিমাপ করে, এ রকম ভাবার কোনো বাস্তব কারণ আছে কি?

শড়খ ঘোষ তাঁর বটপাকুড়ের ফেনা বইয়ে একটা নিবন্ধ লিখেছেন, 'অন্যের ভালো করা।' ১৯৬৭ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকার ৫০০ জন প্রকাশক ও পাঠাগার পেশাজীবী প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে এক চিঠি লেখেন। বলেন, 'আসুন, আমরা আমাদের তরুণদের পৃথিবীর আরেক প্রান্তে নিহত হওয়ার জন্য পাঠানো বন্ধ করি। আসুন, আমরা ভিয়েতনামের মানুষ আর অর্থনীতি ধ্বংস করা বন্ধ করি।'

তখন জন আপডাইক নামের একজন ঔপন্যাসিক বলেছিলেন, 'আই অ্যাম ফর আওয়ার ইনভেনশন ইফ ইট ডাজ সাম গুড।' যদি এতে ভালো হয়, তাহলে আমি সৈন্য প্রেরণ বা হস্তক্ষেপের পক্ষে।

শড়খ ঘোষ বলছেন, 'অন্যের ভালো করার এই মহান দায়িত্ব পরের ৪০ বছর পরে জুড়েও সমানভাবেই চলছে।'

যা-ই হোক, আমেরিকার সঙ্গেও আমাদের বন্ধুত্ব আমাদের স্বার্থেই দরকার। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের রয়েছে দ্বিপীয় বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা, আর তা হলো আমরা আমেরিকায় রপ্তানি করি, আমেরিকা থেকে আমদানি করি খুব কম। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান খাত তৈরি পোশাকের বড় বাজার আমেরিকা। অন্য কোনো কারণে না হোক, শুধু এ কারণে আমাদের উচিত এমন কিছু না করা, যাতে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হয়। এটা আমেরিকার স্বার্থে নয়, আমাদের স্বার্থেই প্রয়োজন।

আমার দুঃখ কী জানেন? আমরা কতগুলো সমস্যা নিজেরা অকারণে তৈরি করলাম। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সারা পৃথিবীতে সম্মানিত মানুষ, তাঁকে আমরা বাংলাদেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ব্যবহার করতে পারতাম। তা না করে তাঁকে হেনস্তা করা হলো অকারণে। আজ কানাডা বা বিশ্বব্যাংক আমাদের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বা তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। আমাদের মানবাধিকার-পরিস্থিতি নিয়ে অতিথিরা কথা বলছেন, এ পরিস্থিতি আমরা নিজেরা তৈরি করেছি। এ সুযোগ আমরা তাঁদের করে দিয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা তো সে জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করে না, যে জাতি নিজেদের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন করে না।

আমাদের রাজনীতি ও বাস্তবতা দেখে মনে হয়, আমরা চাই না দেশে শান্তি থাকুক, আমরা চাই না দেশে স্থিতিশীলতা থাকুক। সেখানে অন্যরা এলেন, বললেন, চলে গেলেন, জয় করলেন কি করলেন না, তাতে কী এসে যায়!

হিলারি ক্লিনটন অনেকটা সময় দিয়েছেন বাংলাদেশের তরুণদের সঙ্গে। বলেছেন, ওইখানেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। সেটা তাঁরা না বললেও আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি। বাংলাদেশের সমস্ত সম্ভাবনার মূলে তার কোটি কোটি তরুণ। যারা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যারা এগিয়ে আসছে। যাদের বেশির ভাগই পড়ে বাংলা মাধ্যমে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে যারা এগিয়ে আসছে, যারা হাজারে হাজারে জিপিএ ফাইভ পায়। যাদের কাছে পয়লা বৈশাখের তাৎপর্য খুবই নিত্তনৈমিত্তিক, যাদের কাছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ তো বলেই রেখেছেন,

'বাহির পানে তাকায় না যে কেউ
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে।
যে যার উচ্চ আপন বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত আয় রে আমার কাঁচা।'

তাই তো তরুণদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের ডাক,

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

আমরা প্রবীণেরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, আমরা বাঁচব না, সবাই মিলে আত্মহত্যা করব, তখন ওই সবুজ তরুণেরাই যদি আমাদের বাঁচায়।

১৫-০৫-২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ কেন মারে?

আমাদের তিন সহকর্মী রাজধানীর ট্রমা সেন্টারের বিছানায় শুয়ে আছেন। আমাদের একজন নিয়মিত প্রদায়ক কিলঘুষি খেয়ে প্রথম আলো অফিসে বসে ছিলেন, তাঁর শরীরজোড়া মারের দাগ, চোখ-মুখ ফোলা। পুরো ঘটনায় আমার কতগুলো অনুভূতি হচ্ছে। এক. নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে। দুই. খুব অপমানিত বোধ করছি। তিন. নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি হয়েছে। চার. আমাদের দেশটা নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে উদ্বেগ সীমাহীনভাবে বেড়ে গেছে। সবটা মিলিয়ে যা তৈরি হয় তা ক্রোধ, ক্ষোভ, হতাশা।

প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিক খালেদ সরকার আর প্রদায়ক হাসান ইমামের ওই সময় (শনিবার, ২৬ মে, ২০১২, সকালবেলা) আগারগাঁওয়ের দিকে যাওয়ার কথা নয়। আমার বন্ধু নদী-বিশেষজ্ঞ ড. মনসুর রহমান ফোন করে আমাকে জানালেন, আগারগাঁওয়ে এক মিলনায়তনে তাঁরা একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার করছেন। দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞরা একটা জনবহুল বদ্বীপের মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকবে, কীভাবে দারিদ্র্যমুক্ত থাকতে পারবে, তাই নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তুলে ধরবেন। আমি সেই খবর ও ছবি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম সংশ্লিষ্টদের। সেই খবর সংগ্রহ করতেই আলোকচিত্রী খালেদ সরকার আর প্রদায়ক হাসান ইমাম আগারগাঁওয়ে গিয়েছিলেন। খবর ও ছবি সংগ্রহ করে তাঁরা ফিরছিলেন।

ওই সময় তাঁরা দেখেন, রাস্তায় পলিটেকনিকের ছাত্রীরা বিক্ষোভ করছেন।

খালেদ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা থেকে মাস্টার্স পাস করে প্রথম আলোয় আলোকচিত্র সাংবাদিকতা করেন। অত্যন্ত বিনয়ী, সদাহাসিমুখ, কর্তব্যপরায়ণ। রাস্তায় একটা ঘটনা ঘটছে, খালেদ ছবি তুলতে আরম্ভ করেন। অন্যদিকে এই ঘটনার ছবি তুলতেই আসেন প্রথম আলোর সাংবাদিক জাহিদুল করিম ও সাজিদ হোসেন।

তখন বিক্ষোভ প্রায় প্রশমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ছাত্রীরা তখনো রাস্তায় রয়ে গেছে। হঠাৎ কোনো ঘটনা ঘটলে 'এক্সক্লুসিভ' ছবি পাবেন, এই আশায় এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটোসাংবাদিক ফাঁকা রাস্তায় একটা পুলিশের গাড়ির পেছনে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতে থাকেন।

এই সময়েই পুলিশের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি হয়। পুলিশ বলে, আপনারা এই রাস্তায় মোটরসাইকেল নিয়ে আসছেন কেন? সাংবাদিক বলেন, ছবি তুলতে। একপর্যায়ে বলেন, যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, আপনি মামলা করেন। গালিগালাজ করছেন কেন?

যাঁদের হাতে লাঠি আছে, অস্ত্র আছে, তাঁরা গালিগালাজ করবেন, তাঁদের কি জিজ্ঞেস করতে আছে, গালি দিচ্ছেন কেন?

পুলিশের কর্তা নির্দেশ দেন পেটাও। সাংবাদিক পেটালে কিছু হয় না।

তারপর শুরু হয় বৃষ্টির মতো মার। কলার ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে মার। রাস্তায় ফেলে মার। লাঠি দিয়ে বেধড়ক মার। কান বরাবর ঘুষি। রাইফেলের বাঁট দিয়ে মার। একজনকে মারতে দেখে আরেকজন সাংবাদিক ছুটে আসেন। তিনজন ফটোসাংবাদিকই প্রচণ্ড প্রহার-বৃষ্টির মধ্যে পড়েন।

গত পরশু ট্রমা সেন্টারে গিয়ে মারের চোটে থেঁতলানো দেহ নিয়ে পড়ে থাকা তিন সাংবাদিককে দেখতে যাই। একজন বলেন, কোত্থেকে সাদা পোশাকের পুলিশ এসে যে চড়াও হয় এবং প্রচণ্ড মার মারতে থাকে, আল্লাহই জানেন।

মারের চোটে একজনের ঠোঁট কেটে গেছে, দড়দড়িয়ে রক্ত পড়ছে। শরীর জোড়া তাঁদের মারের দাগ। ভেতরে মাংস থেঁতলে গেছে। সাজিদের কানের পেছনে এমন ঘুষি মেরেছে, ফলে কালো হয়ে আছে জায়গাটা। আমাদের নিরীহ প্রদায়ক মোবাইল ফোনে এই মারধরের ছবি তুলছিলেন, এবার পুলিশ চড়াও হয় তাঁর ওপর। তাঁকে বেধড়ক কিলঘুষি মেরে তাঁর মোবাইল কেড়ে নেয়।

ওই পুলিশ সদস্যদের বড় আক্রোশ ছিল ক্যামেরার ওপর। তারা ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে চায়। ক্যামেরা নিয়ে টানাটানি হয়। শেষ পর্যন্ত ক্যামেরা তারা কেড়ে নিয়েই ছাড়ে। এই সাংবাদিকদের থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে সারা পথে কিলঘুষি-চড় মারা হয়।

এসি শহীদুলের উক্তিটা তাৎপর্যপূর্ণ। 'এই রকম কত সাংবাদিক দেখছি, কত মারছি। এগুলান রে মারলে কিছু হয় না।'

এখানেই আসে আমার দ্বিতীয় অনুভূতিটার কথা। অপমানবোধ। পুলিশ কিন্তু সাংবাদিকদের মার শুরু করেছে কিলঘুষি-চড় দিয়ে, কলার ধরে টানাটানি দিয়ে। একজন সাংবাদিক হিসেবে এই চড় আমার নিজের গালে এসে লাগছে। আর ওই কথাটা? সাংবাদিক পেটালে কিছু হয় না। সত্যি তো, কিছু হয় না। আমার ছোট ভাই সাগর সরওয়ার, আমার ছোট বোন মেহেরুন রুনি নিজ বাড়িতে নৃশংসভাবে খুন হলো, তাদের দেবদূতের মতো ছেলেটা, মেঘ, বাবা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত্যার বিচার দাবিতে রাস্তায় পর্যন্ত নামল, কী হয়েছে? কিছু হয় না তো আসলে।

ট্রমা সেন্টারে যখন আমি আহত ক্ষত-বিক্ষত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলি, ওঁরা বলেন, কোথাও কোনো বড় গণ্ডগোল হলে সাংবাদিকেরা মারের মধ্যে পড়ে যান, আহত হন, আমরা তো সেটা আমাদের কাজের অংশই ধরে নিয়েছি। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া, কোনো উত্তেজনা ছাড়া শুধু সাংবাদিক পেটানোর জন্যই একযোগে নিরস্ত্র কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হওয়া আর নির্মমভাবে মারা, যেন একটা স্যাডিজমের লক্ষণ; অন্যকে পীড়িত-অত্যাচারিত হতে দেখে আনন্দিত হওয়া।

এ থেকে একটা সার্বিক নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি হয়। সাগর-রুনি মারা যাচ্ছেন নিজের বাড়িতে, বিদেশি কূটনীতিক মারা যাচ্ছেন রাস্তায়, রাজনৈতিক নেতা বা গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা হারিয়ে যাচ্ছেন রাজপথ থেকে, পুলিশ রাজনৈতিক নেতাদের পেটাচ্ছে, শিক্ষকদের পেটাচ্ছে, সাংবাদিকদের পেটাচ্ছে, সংসদ সদস্যকে পেটাচ্ছে। এর আগে পুলিশ কমনওয়েলথে স্বর্ণপদক পাওয়া আসিফকে পিটিয়েছিল।

সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডে কূলকিনারা না হওয়া থেকে শুরু করে গাড়িতে তিন কর্তব্যরত সাংবাদিককে তুলে সারাটা পথ পেটাতে পেটাতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা একত্র করলে একটা তীব্র হতাশার বোধ তৈরি হয় না কি? তার মানে এটা একটা নৈরাজ্যের লক্ষণ।

পুলিশের হাতে লাঠি আছে। পুলিশের হাতে অস্ত্র আছে। সেই কারণেই তাদের শৃঙ্খললার পরিচয় দিতে হবে, সেই কারণেই তাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আপনি গাড়িতে তুলে সাংবাদিককে মারলেন কোন আইনের বলে?

যদি কেউ রং সাইডে মোটরসাইকেল চালিয়ে থাকে, তাহলে তাকে আপনি মারবেন কেন? তার ক্যামেরা কেড়ে নেবেন কেন? কোন্ আইনের ধারায় আপনি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিচ্ছেন। মেমরি কার্ড খুলে নিলেন কোন্ আইনে?

২.

অথচ পুলিশের কাছে আমরা যাই ভরসার সন্ধানে। একটা ঘটনা বলি। ১৯৯০ সালের এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় আমি একজন তরুণ সাংবাদিক, সাপ্তাহিক পূর্বাভাস নামের একটা কাগজ আমরা বের করি। যেদিন পত্রিকা ছাপা হবে, কাজ শেষ করতে করতে রাত হয়ে যায়। স্টেডিয়ামের পত্রিকা অফিস থেকে বের হয়ে প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে হাঁটছি, এরই মধ্যে কারফিউ শুরু হয়ে গেছে। কোনো যানবাহন নেই রাস্তায়। আমাকে যেতে হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকশীবাজার। একটা পুলিশের গাড়ি এসে আমার পাশে থামে। আমাকে বলে, কারফিউ শুরু হয়ে যাচ্ছে, আপনি কই যান? আমি বলি, আমি সাংবাদিক, কাজ শেষ করে ঘরে ফিরছি। ওরা বলেন, রাস্তায় মিলিটারি নেমেছে, আমরা না হয় আপনাকে ছেড়ে দিলাম, মিলিটারির সামনে পড়লে যদি আপনার কিছু হয়। আমি বলি, আমি তো কোনো যানবাহন পাচ্ছি না। একটা কাজ করেন, আমাকে আপনাদের গাড়িতে তুলে একটু বকশীবাজারে নামিয়ে দেন।

ওরা আমাকে গাড়ি করে বকশীবাজারের মোড়ে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আমি জানি, পুলিশ সম্পর্কে মানুষের ধারণা, যাকে বলে, পারসেপশন, সেটা নেতিবাচক। কারা দুর্নীতি বেশি করে, অর্থমন্ত্রী সেই দিনও যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে পুলিশের নাম আছে।

কিন্তু আমি সাধারণভাবে, অতিসরলীকৃতভাবে কথা বলতে চাই না। ভালো মানুষ সব পেশাতেই আছেন। খারাপ মানুষও সব পেশাতেই আছেন। সাংবাদিকদের মধ্যেও ভালো-খারাপ আছে।

পুলিশের বর্তমান আইজি হাসান মাহমুদ খন্দকারকে অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি মৃদভাষী অমায়িক একজন মানুষ বলে আমার মনে হয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার বেনজির আহমেদের একটা বক্তৃতা শুনে আমি কী যে মুগ্ধ হয়েছি। নিখোঁজ মানুষদের সন্ধানে একটা আশ্রয়কেন্দ্র হবে, সেই উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা করলেন। তিনি এই উপমহাদেশে কত কারণে মানুষ হারিয়ে যায়, তার সামাজিক কারণ, ঐতিহাসিক কারণ, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কোথায় কবে হারিয়ে যাওয়ার কী প্রসঙ্গ আছে, এমন সুন্দর করে বললেন যে আমি একেবারে থ বনে গেলাম। আমার লেখা ছাপা হলে যাঁরা সেটার ভালোমন্দ আলোচনা করতে ফোন করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পুলিশ অফিসার। সেদিনও পুলিশের একজন ডিআইজির সঙ্গে দেখা হলো, তিনি গোয়েন্দা শাখায় আছেন, প্রথম কথাই হলো, আনিস ভাই, আমরা কিন্তু আপনার 'মা' বইয়ের ভক্ত। আমি এটা জানি, মা বইটা পুলিশের অনেক কর্তা নিজেরা পড়েন, আর অন্যদের কিনে কিনে উপহার দেন। এই নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে। কমিউনিটি পুলিশ নামে একটা আন্দোলন পুলিশ করার চেষ্টা করছে, আমি তাদের অনুষ্ঠানে মিরপুরে ও উত্তরায় বক্তৃতা দিতে গেছি।

আর আমি ভুলতে পারি না যে একাত্তর সালের ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকে কী নৃশংস হামলাই না করেছিল পাকিস্তানি সেনারা। পুলিশও সেদিন বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন অনেকেই। সেই সব শহীদের নাম রাজারবাগের স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ আছে।

আমি যখন কোনো মোড়ে যানজটে আটকা পড়ি, আমি পুলিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনস্টেবলদের দেখি, কী রোদে কী বৃষ্টিতে এই বিশৃঙ্খল যানগুলোকে 'লাইনে' আনতে কী প্রাণান্তকর পরিশ্রমই তাঁরা করছেন। দূষণকারী ধোঁয়ার মধ্যে নিজেকে ক্ষয়ে দিতে দিতে যানবাহনের গতিটাকে সচল রাখতে কী মরিয়া চেষ্টাই না করে চলেছেন বেচারা।

কাজেই পুলিশকে যখন ঢালাওভাবে গালিগালাজ করা হয়, আমি সেটাকে সমর্থন করতে পারি না।

কিন্তু এর সঙ্গে যখন সহকারী কমিশনার শহীদুল ইসলামের উক্তি মেলাই, সাংবাদিক মারলে কিছু হয় না, তখন সত্যি ভীষণ অপমানিত বোধ করি।

এই মানসিকতা, এই মনোভাবের উৎস কী?

আইনের বাইরে গিয়ে, এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে পুলিশি পদক্ষেপকে যখন রাষ্ট্র উৎসাহিত করছে, এর একটা প্রভাব এই ধরনের মানসিকতার একটা কারণ হতে পারে।

রাজনৈতিক স্বার্থে পুলিশের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

আর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আছে, অবশেষে পুলিশও গাইল রবীন্দ্রসংগীত।

সত্যি সত্যি পুলিশকে সুসংস্কৃত, সুশিক্ষিত হতে হবে। আমি আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি লেখাপড়া করা, সংস্কৃতিচর্চা করা পুলিশের দেখা পেয়েছি। তাঁদের এই সংস্কৃতিবোধটা পুরো পুলিশ বাহিনীতেই ছড়িয়ে দিতে হবে। সে জন্য যেমন তাঁদের প্রশিক্ষণের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করে তুলতে হবে যে প্রতিটা মানুষ সমান, প্রতিটা মানুষের জীবন মূল্যবান, প্রতিটা মানুষের সম্মানই সম্মান, পুলিশের কাজ মানুষকে রক্ষা করা, তাকে আহত করা, অসম্মান করা নয়; তেমনি এর অন্যথা হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই নিতে হবে। যাতে কতিপয়ের জন্য সমগ্রের সম্মানহানি না ঘটে।

এই একটা ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসন গ্রহণ করে, তা শেষ পর্যন্ত মনিটর করার জন্য আমি সাংবাদিকদের অনুরোধ করব।

০৫-০৬-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুকুরচুরি বিলচুরি নদীচুরি

পুকুরচুরির গল্পটা আমরা জানি। একটা পুকুর কাটা হবে। বরাদ্দ হলো লাখ টাকা। সেই টাকা ওঠানো হলো। কাজ চলছে, এই রকমই ধারণা কর্তৃপক্ষের। কিন্তু কাজ আসলে হয়নি। এক ফোঁটা মাটিও কাটা হয়নি। তারপর কর্তৃপক্ষ জানাল, পুকুরটা কেমন হয়েছে, দেখার জন্য ইন্সপেক্টর আসছে। তখন এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হলো। পুকুরটা এলাকায় বড় সমস্যা করছে। পচা পানিতে মশা উৎপন্ন হচ্ছে। এটা বোজাতে হবে। আবার লাখ টাকা বরাদ্দ হলো। তারপর একসময় ইন্সপেক্টর এলেন। এসে দেখলেন, কাজ হয়েছে পাকা। পুকুরটা এমন করে ভরাট করা হয়েছে, মনে হচ্ছে এখানে আদৌ কোনো পুকুর ছিলই না।

এটা আগের কালের গল্প। আজকের দিনের গল্প এই রকম হয় না। আগের দিনে এই অভিযোগ উঠত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে, কিছুটা প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধেও। আজকের দিনে গল্পটা এই রকম :

এলাকায় একটা পুকুর কাটতে হবে। এলাকার প্রতিনিধি তদবিরে নামলেন। এক কোটি টাকা দরকার। এই প্রকল্প অনুমোদনের জন্য দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবানদের একজনের কাছে যেতে হলো। তিনি বললেন, কী প্রজেক্ট বানায়া আনছেন। গাধা নাকি! এক কোটি টাকায় পুকুর হয়! পাঁচ কোটি টাকার প্রজেক্ট বানান।

প্রতিনিধি সাহেব প্রকল্পের সম্ভাব্য খরচ দেখালেন পাঁচ কোটি টাকা। চার কোটি টাকা ওই বড় ভাই নিয়ে নিলেন। এক কোটি টাকা নিয়ে নিলেন প্রতিনিধি সাহেব। প্রকল্প এলাকায় কেউ গেলেন না। কাগজে-কলমে ওই পুকুর এলাকায় আছে। কেউ জানে না। জানার দরকার পড়ে না।

এই কৌতুকটাই এখন এই দেশে প্রচলিত হয়েছে। সেদিনও একজন কলাম লেখক তা পরিবেশন করেছেন। বাংলাদেশের এক কর্তাব্যক্তি বিদেশে গিয়ে সে দেশের সমপর্যায়ের এক কর্তাব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেলেন। বিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাসাদ দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। কেমন করে করলে এই বাড়ি? কয় টাকা বেতন পাও? তিনি জানালা দিয়ে দেখিয়ে বললেন, একটা সেতু দেখতে পাও?

হ্যাঁ।

ওই সেতুর ফিফটি পারসেন্ট দিয়ে এই বাড়ি।

ফিরতি সফরে সেই বিদেশি কর্তাব্যক্তি বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের কর্তাব্যক্তির বাড়িতে উঠে একই প্রশ্ন করলেন। এই বাড়ি তো আমারটার চেয়েও বড় আর সৌকর্যময়। কয় টাকা বেতন পাও? করলে কী করে?

দেশি ব্যক্তি বিদেশিকে জানালার কাছে এনে বললেন, নদীর ওপর সেতু দেখতে পাও?

না।

ওই সেতুর হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে এই বাড়ি।

সবচেয়ে মজা হয় নদীতে বাঁধ দেয়ার জন্য মাটি ফেলার সময়, বালুর বস্তা ফেলার সময়। কত বস্তা ফেলা হলো, আর তা প্রমত্তা নদী ভেঙেচুরে নিয়ে গেল, কে খোঁজ রাখবে। একই গল্প প্রযোজ্য হতে পারে কোনো শুকনো খাল পুনঃখননের বেলাতেও। কতটা মাটি কাটা হলো, কে রাখে তার খোঁজ।

কোম্পানির মাল দরিয়া মে ঢাল। দুর্নীতি সেই কোন্ অতীত আমল থেকে চলে আসছে এই দেশে। আকবর আলি খান তাঁর পরার্থপরতার অর্থনীতি বইয়ে 'শুয়োরের বাচ্চাদের অর্থনীতি' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন এই অঞ্চলে দুর্নীতি কত প্রাচীন। দুই হাজার বছর আগের মনুস্মৃতিতে আছে, 'প্রজাদের রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে রাজা যাদের নিয়োগ করেন, তারাই ভণ্ডামি করে অন্যদের সম্পত্তি গ্রাস করে। রাজাকে এ ধরনের কর্মকর্তাদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে হবে। রাজার দায়িত্ব হলো যেসব দুষ্ট লোক মামলায় বিভিন্ন পক্ষ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া এবং তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।'

দুই হাজার বছর আগের চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে লেখা হয়েছে, 'সরকারি কর্মচারীরা দুভাবে বড়লোক হয় : হয় তারা সরকারকে প্রতারণা করে, অন্যথায় প্রজাদের অত্যাচার করে।' চাণক্য লিখেছেন, আকবর আলি খানের ইংরেজি থেকে অনূদিত বাংলায়, 'জিহ্বার ডগায় বিষ বা মধু থাকলে তা না চেটে থাকা যেমন অবাস্তব, তেমনি অসম্ভব হলো সরকারের তহবিল নিয়ে লেনদেন করে একটুকুও সরকারের সম্পদ চেখে না দেখা। জলে বিতরণরত মাছ কখন জল পান করে তা জানা যেমন অসম্ভব, তেমনি নির্ণয় সম্ভব নয় কখন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা তহবিল তছরুপ করে।'

আকবর আলি খান দেখিয়েছেন, বাদশাহি আমলে এই দেশে দুর্নীতি হয়েছে, ব্রিটিশ আমলে হয়েছে। আর এই আমলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের পাড়াতেই থাকতেন এমপি সাহেব। আমি তখন হাফপ্যান্ট পরি। মামা চাকরির জন্য দরখাস্ত করবেন। তাঁর দরখাস্তে এমপির সুপারিশ লাগবে। আমি হাফপ্যান্ট পরে চলে গেলাম সকালবেলা এমপি সাহেবের বাসায়, তিনি দরখাস্ত দেখেই হাত বাড়িয়ে তাতে সুপারিশ করে দিলেন। আমিও হাসিমুখে চলে এলাম। এমপি নিয়োগ দিয়ে ঘুষ খান, এমপি স্কুলে ছাত্র ভর্তি করিয়ে ঘুষ খান, এ ধরনের ঘটনা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

আমার খুব দুর্ভাবনা হয়। দুর্নীতির কত ধরনের মুখরোচক গল্প যে শুনি। এই যে ৫০ কোটি টাকার কাজকে ৫০০ কোটি টাকার কাজ বানানোর গল্প শুনি, বাস্তবে তা-ই যদি ঘটে থাকে, তার প্রতিক্রিয়াটা কী হবে? ধরা যাক, সরকার একটা হেলিকপ্টার বা ট্রাক্টর কিনবে। তার দাম ১০ কোটি টাকা। সেটা কেনা হলো ১০০ কোটি টাকা দিয়ে। ৯০ কোটি টাকা চলে গেল কারও পকেটে। আচ্ছা, সেই ৯০ কোটি টাকা তিনি কোথায় রাখেন? ব্যাংকে নাকি বালিশের ভেতরে? ব্যাংকে রাখলে কোন্ ব্যাংক? দেশি ব্যাংক, নাকি বিদেশি ব্যাংক? নাকি সুইস ব্যাংক?

সরকারের এই টাকা সরকার পায় কোত্থেকে? গরিব মানুষ একটা সিনেমা দেখলে কর দেয়। একটা বিড়ি খেলে তাকে ট্যাক্স গুনতে হয়। আয়কর দেন জনগণ। আমদানি-রপ্তানি কেনাকাটা করতে খাজনা, শুল্ক, কর, ভ্যাট দিতে হয়। তার প্রতিটির প্রভাব পড়ে গরিব জনগণের ওপর। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব। হায়, আমার গরিব দেশের গরিব কৃষক-শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষ! তুমি কি জানো, তুমি নুন খেতে গিয়ে যে কর দিচ্ছ, তা তোমার দেশের রাজরাজড়ারা চুরি করছে।

কোনো পেশার দুর্নীতি নিয়ে দুর্নাম বহু পুরোনো। কাস্টমস, ট্যাক্সে যাঁরা চাকরি করেন, তহসিলদার সাহেব, প্রকৌশলী, দারোগা সাহেব, তাঁদের বাড়িটা পাকা হবে, তা এই দেশের মানুষ বহুদিন থেকে দেখে আসছে। কিন্তু সর্বস্তরে এমন সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কথা কি চল্লিশ বছর আগে কেউ ভাবতে পারত?

সর্বস্তরে দুর্নীতি। আগে ছিল পুকুরচুরি, এখন বিল-হ্রদচুরি, নদীচুরি, সমুদ্রচুরি চলছে। দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় কেনাকাটায়, লাইসেন্স দিতে, পারমিট দিতে। পুলিশ যদি ধরে তাহলে টাকা, যদি ছেড়ে দেয় তাহলে টাকা। যেখানেই কোনো সরকারি সার্টিফিকেট লাগবে, সেখানেই টাকা। ভাঙা গাড়ি ফিটনেস সার্টিফিকেট পাবে, টাকা থাকলেই। যে কেউ ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারে, টাকা খরচ করলেই। টেলিভিশনের পারমিশন থেকে শুরু করে পরিবেশ ছাড়পত্র, টাকা। নিয়োগের জন্য টাকা। বদলির জন্য টাকা। আর আছে জবরদখল। সরকারি জমি তো দখল হবেই, যেকোনো মানুষের জমি দখল করে টাকা নেয়া যেতে পারে। নিজের জমিতে বাড়ি করবেন, টাকা গুনুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য নয় যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার আর কোনো কথা বলে না। অথচ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহুমুখী শক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। ক্ষমতাবান লোকেরা প্রতিবছর সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবেন। দুর্নীতি, ঘুষ, চাঁদাবাজি ইত্যাদির নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সেসব কথা আওয়ামী লীগ ভুলে গেছে। অর্থমন্ত্রী হতাশ, নাহ, আর হলো না।

কত টাকা লাগে একজন মানুষের, এক জীবনে? কেন একজন নেতা দুর্নীতি করবেন? কেন একজন এমপি এলাকার লোকদের কাছ থেকে নিয়োগের আশ্বাস দিয়ে টাকা নেবেন?

কোথাও কোনো জবাবদিহি নেই। শুধু বলতে চাই, পাওয়ার করাপ্টস অ্যান্ড অ্যাবসোলুট পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসোলুটলি। ক্ষমতা যত কেন্দ্রীভূত হবে, দুর্নীতি তত বাড়বে। কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষ থেকে একেবারে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র দুর্নীতির উন্মুক্ত ও উন্মত্ত চর্চা—আমরা যে অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। এখন এই দেশে শিক্ষকেরা পর্যন্ত দুর্নীতি করেন, চিকিৎসকেরা করেন, মাদ্রাসা প্রশাসনে পর্যন্ত দুর্নীতি হয়, আমরা যাব কই।

দুর্নীতি না হলে আমাদের রাস্তাঘাট ভালো থাকত। দুর্নীতি না হলে আমাদের বাস-ট্রেন সুন্দর হতো। দুর্নীতি না হলে আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া যেত, সেগুলোর পরিবেশ উন্নত থাকত। দুর্নীতি না হলে মানুষ থানায় গিয়ে ভরসা পেত, বিচার পেত। দুর্নীতি না হলে কৃষক সস্তায় সার পেত, কৃষিপণ্য পেত। দুর্নীতি না হলে মানুষ বিদ্যুৎ পেত। দুর্নীতি না হলে জমিজমা নিয়ে এত মামলা-মোকদ্দমা হতো না। দুর্নীতি না হলে আমাদের ফলে কারবাইড বা ফরমালিন থাকত না, আমাদের নদীতে পানির বদলে আলকাতরা প্রবাহিত হতো না, আমাদের জমিজমা-নদ-নদী রাস্তাঘাট বেদখল হতো না।

আমি জানি না, এই সমস্যার সমাধান কী? আকবর আলি খান লিখেছেন, 'নিজেদের দুর্নীতি হ্রাসে সরকারি কর্মচারীদের সাধারণত কোনো আগ্রহ থাকে না, তাদের অনেকেই হচ্ছে দুর্নীতির প্রধান পোষক। রাজনৈতিক নেতারা অনেকেই দুর্নীতি দূর করতে চান। কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের প্রতিরোধের মুখে তাঁরা অকার্যকর, অনেক সময় তাঁরা নিজেরাও একই ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।'

আমি তো রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দুর্নীতি দূর করার কোনো প্রতিজ্ঞা দেখি না। আমরা কি দেশটাকে চুষে শুষে ফুলবনে মত্তহস্তির মতো সবকিছু পায়ে দলে শেষ করে দেব বলেই প্রতিজ্ঞা করে নেমেছি?

১২-০৬-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুড়ি বছর পরের বাংলাদেশ

আজ থেকে কুড়ি বছর পরে, ২০৩২ সালে, কেমন হবে বাংলাদেশ?

আজকের সংবাদপত্র খুলে কোথাও কোনো আশা দেখতে পাই না। আশুলিয়ায় পোশাক তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ, শ্রমিকেরা রাস্তায়, প্রাণপণ লড়াই করছে পুলিশের সঙ্গে। সংবাদপত্রের শিরোনাম, আশুলিয়া-কাঁচপুর রণক্ষেত্র। এসব শিরোনাম আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, শব্দ তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য হারিয়েছে, রণক্ষেত্র মানে যে যুদ্ধের ময়দান, এই কথাটা আমরা, পাঠকেরা খুব আর ভেবে দেখি না। অন্যদিকে, শেয়ার মার্কেটের হতাশ বিনিয়োগকারীরা রাস্তায় বসে পড়েছেন। খবরে প্রকাশ, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা শেয়ারবাজার ছেড়ে যাচ্ছেন। মহাসড়কে খানাখন্দ। সড়ক দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক, তার ওপর যানজট। ঢাকা শহর চলে না, কিন্তু ঢাকা থেকে বাইরেও যাওয়া কষ্টকর। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বা খুলনা বা রাজশাহী বা সিলেট বা ময়মনসিংহ যাত্রা করলে গন্তব্যে কখন পৌঁছানো যাবে, কেউ বলতে পারে না। অন্যদিকে, টিআইবির বার্ষিক সাধারণ সভায় 'রাজনৈতিক সদইচ্ছার অভাবে দুর্নীতির ব্যাপকতায়' উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। আরেকটি সেমিনারে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেছেন, 'বাংলাদেশে শুধু অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি নয়, আন্তর্জাতিক দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দেশের বড় বড় দুর্নীতিবাজ শাস্তি না পেয়ে উল্টো পুরস্কৃত হচ্ছেন বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।... দেশীয় দুর্নীতিবাজদের অনৈতিকতা ও অবয়কে রাষ্ট্র থেকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, কুইক রেন্টালে ব্যাপক দুর্নীতি হলেও এ নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না নির্দেশ রয়েছে। এ জন্য এ খাতের অবস্থা এখন যথেচ্ছা হয়ে পড়েছে।' (দৈনিক যুগান্তর, ১৮ জুন ২০১২) মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ এখন দুর্নীতিবাজদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের বস্তা বাঁধতে ব্যস্ত, দেশ শেষ হয়ে যাক, মানুষ নিশ্চিহ্ন হোক; পরিবেশ, ও আবার কোন্ বালাই! এটা সলিমুদ্দি-কলিমুদ্দির মনোভাব হলে এক; কিন্তু শীর্ষস্থানীয়রা, ক্ষমতাবানেরা যখন কেবল নিজের পোঁটলাটা সামলাতে ব্যস্ত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আশার আর কোনো জায়গা থাকে না। তখন সবকিছু ভেঙে পড়ে! তখন রাস্তাঘাট অচল হয়ে পড়ে, পুলিশ কথা শোনে না, বাতি জ্বলে না, সেতুর জায়গায় সেতু গড়ে ওঠে না। আমরা কেবল দুর্নীতিবাজ নই, আমরা অদক্ষও। বছর শেষে বাজেট ফিরে যায়, কারণ আমরা খরচ করতে পারি না। বাজেট যাতে ফিরে না যায়, সে জন্য তড়িঘড়ি করে প্রকল্প হাতে নেয়া হয় এবং হরিলুট হয়।

দেশটা আসলে চলছে না। কিন্তু তবু তো চলছেই। খেয়েপরে বেঁচেই তো আছি। বাজারে গেলে তো চাল-ডাল কিনতেও পারি। আবার টাকা দিলে তো দোকানি জিনিসপাতি দেয়ও। এখনো তো এই নৈরাজ্য আসেনি, টাকা দিলাম, বললাম, দু কেজি চাল দাও, দোকানি গলা ধাক্কা দিয়ে বলল, টাকা দিলেই চাল দিতে হবে, এটা মগের মুল্লুক নাকি! এই যে বলছি, দেশ চলছে না, আবার বলছি চলছে, এই কথাটার মানে হলো, দেশের চাকা ঘোরাচ্ছে সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশের মেহনতি কৃষক। স্বাধীনতার সময়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল, এখন জনসংখ্যা তার দ্বিগুণ, কিন্তু কী বিপ্লবটাই না ঘটে গেছে কৃষিক্ষেত্রে, বছরে তিন ফসল, মাছ চাষে বিপ্লব, পোলট্রি খাতে বিপ্লব, এ কি যা-তা কথা। কাজ করছেন আমাদের উদ্যোক্তারা, ব্যবসায়ীরা, কারিগরেরা, শ্রমিকেরা। বিচিত্র ব্যবসা, বিচিত্র শিল্পোদ্যোগ। আর আছেন আমাদের প্রবাসী শ্রমিকেরা, যাঁরা বহু কষ্টে বিদেশে যান, ততোধিক কষ্ট করে আয় করেন এবং দেশে টাকা পাঠান। এই যে প্রতিটা মানুষের নিজস্ব উদ্যোগ, এটাই দেশের চাকাটা ঘোরাচ্ছে। আর আমরা, কতিপয় স্বার্থভোগী মানুষ, এই সাধারণ পরিশ্রমী সৎ মানুষের পথচলাটাকে প্রতিনিয়ত থামিয়ে দিয়ে বলছি, টাকা দাও। আমাদের কোটি কোটি টাকা দরকার। দাও দাও। আমাদের কর্তব্য ছিল তাদের চলার পথটা মসৃণ করব, তাদের চলার গতিটা ত্বরান্বিত করব, নির্বিঘ্ন করব, কিন্তু করছি উল্টোটা। দেশে যে যথাসময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় না, দেশে যে পদ্মা সেতু হয় না, সে দোষ তো গরিব দেশবাসীর নয়! কিন্তু ভুগতে হবে তাদেরই।

এ অবস্থায় আশা কোথায়?

দুই বছর পরে দেশটার কী হবে? যথাসময়ে নির্বাচন হবে? সেই নির্বাচনে সব দল অংশ নেবে? ফলটা মোটামুটি গ্রহণীয় হবে, জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটবে নির্বাচনে? আমাদের মুদ্রার যে মাত্র দুটো পিঠ, দুই পিঠই তো আমরা দেখে ফেলেছি। আমরা যে বারবার ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপিত হচ্ছি। সেই কথাটা ভাবলেও তো চোখেমুখে অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখি না। বাংলাদেশের মানুষের সামনে বাছাই করে নেয়ার জন্য আছে দুটো দল বা জোট, হয় বিএনপি, নয়তো আওয়ামী লীগ। দুবার করে উভয়ের শাসনই দেখা হলো! তবু তো জনগণ পাঁচ বছর পর পর ভোট দিয়ে ক্ষমতায় কে যাবে নির্ধারণ করার মালিক ছিল, জনতার সেই ক্ষমতাটাও আদৌ থাকবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো! আমাদের নেতাদের কথাবার্তা, হাবে-ভাবে বোঝা যায়, তাঁরা মনে করেন, তাঁরা খুব ভালো দেশ চালাচ্ছেন বা অতীতে চালিয়েছেন, তাঁদের আচার-আচরণ পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটেনি।

এ অবস্থায় আগামী পাঁচ বছর পরের বাংলাদেশটা কেমন হবে, কল্পনা করতে পারি না। দশ বছর পরের বাংলাদেশ কেমন হবে, হয়তো কল্পনা করা যায়, কিন্তু কল্পনা করার সাহস পাই না। একমাত্র উপায় হলো, কল্পনায় বিশ বছর পরের বাংলাদেশটাকে দেখা।

সেদিন অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিনায়ক সেন, আকবর আলি খান এসেছিলেন প্রথম আলোর কার্যালয়ে, বাজেট নিয়ে কথা বলতে। ড. মোস্তাফিজুর রহমানই বললেন, ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলে সাত বছরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়, আজকে যদি মাথাপিছু আয় ৮০০ ডলার হয়, সাত বছর পরে হবে ১৬০০ ডলার, ১৪ বছর পরে ৩২০০ ডলার, ২১ বছর পরে ৬৪০০ ডলার। সেটা একটা কল্পনা হতে পারে। আরেকটা কল্পনা হলো, শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়া তখন অবসরে যাবেন। তখন দেশটার নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে। আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাসে রাজনীতিতে পারিবারিক পরিচয়ই তো সবচেয়ে বড় উপাদান।

থাক। কল্পনা করতে পারছি না। রংপুরে গিয়েছিলাম জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। ২৩০০ ছেলেমেয়ের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। এরা সবাই মাধ্যমিক পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো ফলটুকু অর্জন করে নিয়েছে। একজন বক্তৃতা করল, সে তিস্তা নদের জেলের ছেলে। সারা রাত বাবার সঙ্গে মাছ ধরে সকালবেলা ফিরেছে। বাবা বাজারে গেছে মাছ বেচে চাল কিনে ফিরেছেন, তারপর পরিবারের সবার খাবার জুটেছে। শিক্ষা একটা জাদুর কাঠি। কলকাতা থেকে কত দূরে ছিল বিদ্যাসাগরের বাড়ি, সেই যে হেঁটে হেঁটে মাইলফলক দেখে ধারাপাত শিখেছেন, আর কলকাতায় যে বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর পা পুরোটো মেলা যেত না। কিন্তু লেখাপড়া শিখে কেবল নিজে পাল্টে গেলেন না, সমাজটাকে পাল্টানোর ব্রতও তো গ্রহণ করলেন। পায়রাবন্দের রোকেয়া বাড়ির নিষেধ উপেক্ষা করে ইংরেজি আর বাংলা পড়তেন বলেই না আজ বাংলাদেশের নারীরা এতটা এগিয়ে! ৯০ ভাগের বেশি ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, আশি হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। বিশ বছর পর এই বাচ্চাদের বয়স হবে ৩৬-৩৭। ওরা দায়িত্ব নেবে এই দেশটা গড়ার। ওরা কৃষক হলে ভালো কৃষক হবে, শ্রমিক হলে লেখাপড়া জানা শ্রমিক হবে। ওদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে নতুন দিনের দেশ গড়ার কারিগরেরা। ওরা অনেকেই বিদেশ যাবে এবং পাঠাবে মূল্যবান বিদেশি মুদ্রা, আর পাঠাবে তার চেয়েও মূল্যবান জ্ঞান, প্রযুক্তি, আইডিয়া।

পুঁজি গড়ে ওঠার কালে নৈরাজ্য হয়, লুটপাট হয়। কিন্তু পুঁজি গড়ে ওঠার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে নিজের স্বার্থেই নিজেকে পাহারা দেয়, তার তখন দরকার হয় আইনের শাসন। সেটা কি কুড়ি বছর পরে পাব না?

অন্যদিকে, সর্বব্যাপী লুটপাট, তার সঙ্গে ক্ষমতায় থাকার ওতপ্রোত সম্পর্ক আমাদের রাজনীতিকে করে তুলেছে সংঘাতময়, সেটা কত ভয়াবহ পর্যায় পর্যন্ত যাবে, আমরা জানি না। আইভরি কোস্টে দুজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীই নির্বাচনে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছিলেন, তারপর দুজনেই শপথ নিয়ে ফেলেছিলেন, তারপর শুরু হয়েছিল দুই পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই। আমরা কি সেই রকম সংঘর্ষের দিকে যাব? একটা ব্যাখ্যা হলো, আফ্রিকায় কৃষিসভ্যতাই আসেনি, আমরা কৃষিসভ্যতাটা পেয়েছিলাম। কাজেই একেবারে পুরোপুরি ব্যর্থ একটা রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার কোনো আশঙ্কা আমাদের নেই।

যে জাতি যে রকম, সেই জাতি সেই রকম নেতাই তৈরি করে। কিন্তু এই জাতি তো একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নেতা, তাজউদ্দীন আহমদের মতো সংগঠক পেয়েছিল। সময়ও তো মানুষ তৈরি করে। আমরা কি একজন যোগ্য নেতা পাব না? নাকি যোগ্য নেতা পাওয়ার মতো যোগ্যতা এই জাতির হয়নি! দুঃখে আমার প্রাণ ফেটে যায়, যখন দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা চিকিৎসক বা প্রকৌশলীর মতো শিক্ষিত মানুষ নির্লজ্জ দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় শামিল হন! কিন্তু তারও চেয়ে অধিক দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের নেতারা এই প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, কে কত বড়লোক হতে পারেন, কে কত কামিয়ে নিতে পারেন। না, বর্তমান নিয়ে শোক আর করব না!

ভবিষ্যতের স্বপ্নই দেখি। একটা নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে। তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে দুনিয়া-সেরা ক্রিকেট অলরাউন্ডার, তারা এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় ওড়ায় দেশের পতাকা। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোদ্যোগ, শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে আসছে নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে, সৃজনশীলতা নিয়ে।

তারা নিশ্চয়ই যোগ্য নেতা পাওয়ার যোগ্যতা নিয়েই বেড়ে উঠছে, এগিয়ে আসছে।

আজ থেকে বিশ বছর পরে বাংলাদেশ যে একটা উন্নত আলোকিতসম্পন্ন বাংলাদেশ হবে, এটা একটা গাণিতিক বাস্তবতা।

২৬-০৬-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় প্রকাশকগণ, অনেক তো হলো...

বাংলা একাডেমী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী বছর থেকে বইমেলা হবে কেবল প্রকাশকদের মেলা। কোনো সংগঠনের নামে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হবে না। আর বইমেলা সীমিত থাকবে কেবল একাডেমীর সীমানাপ্রাচীরের মধ্যে। এই সিদ্ধান্ত কে স্বাগত জানাই। বইমেলা অবশ্যই প্রকাশকদের মেলা হওয়া উচিত, স্টলের সংখ্যা হওয়া উচিত কম, বিশেষ করে যখন ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা বাড়ছে, দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে, আর বাংলা একাডেমীর আঙিনা নতুন ভবন নির্মাণের কারণে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। স্টলের সংখ্যা কম হলে হয়তো একটুখানি দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া যাবে, জিরোনোর জায়গা যদি না-ও মেলে।

আমাদের দেশে প্রকাশকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। বইয়ের প্রকাশনার মানও আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছে। ঝকঝকে ছাপা, রঙিন প্রচ্ছদ, কোনো কোনো প্রকাশকের বইয়ের বাঁধাইও খুব ভালো, কাগজ ধবধবে সাদা। বইটা দেখলেই হাতে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করলেই বুঝবেন, রূপে চমৎকার বইটি আসলে ভুলে ভরা। ভুল বাক্য, ভুল বানান। এ ধরনের একটা বই ছাপা হওয়াই উচিত নয়!

বলতে পারেন, আপনারা লেখক, আপনারা খারাপ লেখেন বলেই বইটা খারাপ বেরোয়। সেটা একটা অভিযোগ হতে পারে বটে, আমি মানছি। কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলী কি রবীন্দ্রনাথ খারাপ লিখেছিলেন? ওই বই যখন বাংলাদেশ থেকে বেরোয়, তখন বেশির ভাগ প্রকাশনায় কেন ভুলের ছড়াছড়ি?

একটা কারণ, ভুলটাকে আমরা মেনে নিয়েছি। নির্ভুল বই বের করার আকাঙ্ক্ষা-প্রতিজ্ঞা কোনোটাই আমাদের নেই। এবং সম্ভবত অনেক প্রকাশকের সেই যোগ্যতাও নেই। রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ করতে হলে যা দরকার তা হলো দক্ষ প্রুফ রিডার। আমাদের দেশে এই ক্ষেত্রটা চরম অবহেলিত। প্রুফ রিডারদের আমরা সম্মানও দিতে চাই না, সম্মানীও দিতে চাই না। যেকোনো একজনকে বসিয়ে দিই প্রুফ সংশোধনের কাজে। ফলে বইগুলোতে ভুল থেকেই যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সব লেখক তো রবীন্দ্রনাথ নন। আবার খোদ রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্রে আমরা দেখি, তিনি যে বানানে লিখেছেন, বই করার সময় সব সময় সেই বানান রাখা হয়নি। পরের দিকে তার বানানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা হয়েছে। তার মানে যা দরকার তা হলো পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা। আমি যখন *প্রথম আলোয়* একটা লেখা জমা দিই, আমি জানি, এই লেখা আরও তিনজন পড়বেন, সম্পাদনা করবেন, কেবল বাক্য গঠনের ভুল কিংবা বানানের ভুল নয়, তথ্যের অসংগতি, বক্তব্যের অসামঞ্জস্য তারা দূর করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি যখন আমার লেখা কোনো প্রকাশকের হাতে তুলে দিই, আমি জানি, এই লেখা কেউ সম্পাদনা করবেন না। শুধু একজন প্রুফ সংশোধক, যিনি মোটেও পেশাদার নন, প্রুফ দেখে দেবেন। সেটাও কখনো কখনো বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমি হয়তো লিখেছি 'স্টিফেন হকিং', প্রুফ সংশোধক সেটাকে 'স্টিফেন হকিন্স' করে দিয়েছেন। আমি হয়তো লিখেছি 'ফুল তুলে মালা গাঁথি', বই প্রকাশের পরে দেখি ছাপা হয়েছে 'ফুল তোলে মালা গাঁথি'। প্রুফ সংশোধন যে একটা বিশেষ দক্ষতা ও যোগ্যতার ব্যাপার, সবার চোখে সব ভুল ধরা পড়ে না, এটা আমরা মনে রাখি না।

সারা পৃথিবীতেই বিখ্যাত মানুষদের আত্মজীবনীর বই বের হয়। পর্বতারোহী, গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকা, রাষ্ট্রপতি, কিংবা রাষ্ট্রপতির পত্নী, এঁরা বই লিখলে সে বই বিক্রি হয় ভালো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই বইগুলো তাঁরা নিজেরা লেখেন না। তাঁদের জন্য লেখক নিযুক্ত করা হয়। তিনি ওই ব্যক্তির কাছ থেকে গল্প শুনে নিয়ে লিখে দেন। আর শুধু পাণ্ডুলিপি হাতে এলেই প্রকাশকেরা প্রকাশ করেন না। তাঁরা সেই পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেন। সে জন্য পেশাদার সম্পাদক আছেন। এই সম্পাদকেরা অনেক মাতব্বরিই করেন। বইয়ের নাম কী হবে, শুরুটা কেমন করে করতে হবে, কোন অংশ অপ্রয়োজনীয়, কোন অংশ আরেকটু বাড়াতে হবে, সম্পাদকেরা সে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লেখকেরা সেই পরামর্শ মেনে নেন। বানান ভুল, বা বাক্যের ভুল তো অবশ্যই সংশোধিত হয়। তথ্যগত ভুল ধরার জন্যও সম্পাদক থাকে। এ কারণে অনেক দেশে একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরির পর বই বের হতে বছরখানেক সময় লেগে যায়। আর ওই পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেও লেখক কমপক্ষে বছরখানেক সময় নেন। কেউ হয়তো তিন-চার বছর ধরেই পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন।

আমি চাই, আমাদের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সম্পাদক থাকুক। প্রকাশকদের বলি, প্রিয় প্রকাশকগণ, লাভ তো কম করলেন না, এবার একটু পেশাদার হোন। সম্পাদক নিয়োগ করুন। তাঁরা পাণ্ডুলিপি বাছবেন, পাণ্ডুলিপি ঘষামাজা করবেন। তাঁরা আমাকে পরামর্শ দেবেন, বলবেন, আপনি এই জায়গাটা একটু বদলে দিন। আপনার শেষটা ভালো হয়নি। আমরা জানি, টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস এলিয়টের কবিতা 'ওয়েস্ট ল্যান্ডে'র অনেক অংশ এজরা পাউন্ড ফেলে দিয়েছিলেন। তাতে ওই কবিতার শ্রীবৃদ্ধিই ঘটেছিল।

সারা পৃথিবীতেই নিজের খরচে বই বের করার রেওয়াজ আছে। এটা দোষের ব্যাপার নয়। কিন্তু ওই পাণ্ডুলিপিটাও সুসম্পাদিত হয়ে তারপর প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলতে বাধ্য হব, আমাদের বাংলাদেশে প্রকাশিত বহু বই প্রকাশ না হলেই ভালো হতো। এগুলো ঠিক এই অবস্থায় প্রকাশযোগ্য নয়। হয়তো একটু সম্পাদিত হলে এই পাণ্ডুলিপিগুলো থেকেই সুন্দর বই প্রকাশ করা যেত।

আবার যাঁরা বলেন, বইমেলায় আমার পড়ার মতো কোনো বই নেই, তাদের সঙ্গেও আমি একমত নই। প্রতিবছরই বইমেলায় চমৎকার কিছু বই বেরোয়। সাম্প্রতিক লেখকদের বইয়ের কথায় পরে আসছি, আমাদের কি বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী বই সব পড়া হয়ে গেছে? আমরা কি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো পড়ে ফেলেছি! বইমেলায় মুদ্রণপ্রমাদে কণ্টকিত রবীন্দ্রনাথ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি প্রতীক/অবসরের নির্ভুল রবীন্দ্র-নজরুল-মানিক-ওয়ালীউল্লাহ্‌ও তো পাওয়া যায়। এই বইমেলা এখন গোলাপ নিয়ে আবদুশ শাকুরের সহস্র পৃষ্ঠার বই প্রকাশ করার যোগ্যতা যেমন অর্জন করেছে, তেমনি *শিল্পীর চোখে ঢাকা* নামের হাজার টাকা দামের বইটি তো এই বইমেলাতেই *প্রথমা* আনতে পেরেছে। আর আছেন আমাদের তরুণ প্রথাবিরোধী নতুন ধারার লেখকেরা। প্রতিবছর কোনো না কোনো তরুণ তারুণ্যের স্পর্ধা নিয়ে হাজির হন মেলায়। শুদ্ধস্বরের দিকে গেলে, লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে গেলে তাদের খোঁজ পাওয়া যায়। আর আছে অনুবাদের বই। অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমি বলব, খারাপ অনুবাদের বই যেমন বের হয়, তেমনি ভালো হাতের সুন্দর অনুবাদের বইও বইমেলাতেই পাওয়া যায়। সেবা প্রকাশনীর প্রকাশনার নির্ভুলতা নিয়ে আমি সব সময়ই আস্থাবান। এবার *প্রথমা* থেকে প্রকাশিত কার্লোস ফুয়েন্তেসের *আউরা* কিংবা মারিও বার্গাস য়োসার বইটা নিয়ে দিব্যি সন্তোষ প্রকাশ করা চলে। এখানেও একটা 'কিন্তু' আছে। আমরা অনুবাদ করার সময় ও প্রকাশ করার আগে যথাযথ স্থান থেকে প্রায় ক্ষেত্রেই অনুমতি নিই না। এই কাজটাও আমাদের করতে পারতে হবে। মূল লেখকের বা প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া অনুবাদ প্রকাশ করা উচিত নয়।

দুটো মজার ঘটনা বলে এই লেখা শেষ করব। রবার্ট লুইস স্টিফেনসন *দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডক্টর জেকিল অ্যান্ড হাইড* ছয় দিনে দুইবার লিখেছিলেন। প্রথমবার লিখতে তাঁর সময় লেগেছিল তিন দিন। তাঁর স্ত্রী ফ্যানির সেটা ভালো লাগেনি, থ্রিলার-মার্কা লেগেছিল। ফ্যানি সে কথা স্বামীকে জানালে যা হয় তাই হয়েছিল। লেখক রেগে গিয়েছিলেন। পরে তিনি ভেবে দেখলেন, বউয়ের কথাই ঠিক। আগুনে সেই পাণ্ডুলিপি ছুড়ে ফেলে দিয়ে আবার লিখতে বসলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র তিন দিনে লিখে ফেললেন সেই বইটি, যা আজও আমরা পড়ে থাকি। কাজেই তিন দিনে বই লিখলেই খারাপ হয় না, আবার তিন বছর ধরে লিখলেই ভালো হবে, এই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।

বিখ্যাত নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল বেকেটের একটি উপন্যাস *মারফি* মোট ৪২ জন প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তারপর ৪৩তম প্রকাশক সেটা ছাপেন। সেটা বিক্রিও হয়নি, তার কোনো প্রশংসাও জোটেনি। স্যামুয়েল বেকেটের সাফল্য শুরু হয় তাঁর ৪৭ বছর বয়সে। ৮০ বছর বয়সে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

মিরোস্লাভ হোলুবের একটা কবিতায় স্যামুয়েল বেকেটের একটা উদ্ধৃতি আছে। এই কবিতাটা আমার খুব প্রিয়, আর প্রিয় এর ভেতরে ব্যবহৃত বেকেটের কথাটা।

"যদিও শিল্পী হওয়া মানেই ব্যর্থ হওয়া আর শিল্প মাত্রই ব্যর্থতার বশংবদ–যেমনটা বলেছেন স্যামুয়েল বেকেট, কবিতা তবুও মানুষের শেষ কাজগুলোর নয়, প্রথম কাজগুলোর একটি।"

যিনি শিল্পী তাঁকে ব্যর্থ হতেই হবে। আর যিনি ব্যর্থ হবেন, তাঁর হাত দিয়েই সম্ভব হবে শিল্প।

কাজেই ব্যর্থতাকে আমরা ভয় পাই না। ব্যর্থতার আগুনে পুড়েই একদিন হয়তো আমাদের হাত থেকেই শিল্পরচনা সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

১০-০৭-২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুনের পরশমণি

অজপাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায়, চিরিরবন্দর হলো তা-ই। এটা একটা উপজেলা বটে, তবে দিনাজপুরের এই উপজেলা বন্দরটিকে সর্ব অর্থে পিছিয়ে পড়া এলাকাই বলতে হবে। রংপুর থেকে গাড়িতে ঘণ্টা খানেক। রাস্তা ভালো, দুই ধারে ধানখেত, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ওই দূরে দেখা যায় মানুষের বসতি। সেই চিরিরবন্দরে ধানখেতের মধ্যে উঠছে একটা পাঁচ-ছয়তলা ভবন। অনেকটা ঢাকার ছয়তলা ফ্যাটবাড়ির মতো দেখতে। তাতে সাইনবোর্ড : আবাসিক বিদ্যালয়। তিন দিকে ধানখেত, এখানে আবাসিক স্কুল কেন? কারণ, ভালো কাজের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে এই এলাকায়।

শুরুটা করেছেন অর্থোপেডিক চিকিৎসক অধ্যাপক এম আমজাদ হোসেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর বিভাগের প্রধান ছিলেন। একবার আমি যে মিনি+বেবি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম, মানে সামনে একটা মিনিবাস দাঁড়িয়ে ছিল, তার পেছনে আমার বেবিট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়াল, আর একটা মিনিবাস এসে আমাদের বেবিট্যাক্সিটাকে ধাক্কা দিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিল, আমার ঠ্যাং নিয়ে আমি আর দাঁড়াতে পারি না, বেবিট্যাক্সিটা একেবারে কাগজের ঠোঙার মতো হয়ে গেল দুমড়েমুচড়ে। ওই সময় আমার পায়ে প্লাস্টার করে দিয়েছিলেন সদাশয় ডা. আমজাদ হোসেন। আমার পদমর্যাদা রক্ষার জন্য ডাক্তার সাহেবের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে আমার মাঝেমধ্যে দেখা হয়, সেটাও এমন জায়গায়, যেখানে আপনি 'না' বলতে পারবেন না। ঢাকার একটা জিমনেসিয়ামে, ড্রেসিংরুমে, আমি হয়তো সাঁতার কেটে ফিরে কাপড় পাল্টাচ্ছি, তিনিও ব্যায়াম সেরে এসে পোশাক পাল্টাচ্ছেন। নিজের শরীরে যখন মাত্র একটা তোয়ালে, তখন যেকোনো প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। ডা. আমজাদ বললেন, 'চিরিরবন্দর গ্রামে আমরা একটা স্কুল করেছি। আনিস ভাই, বলেন, কবে যাবেন?'

'যাব যাব' বলে আমি প্যান্টে পা গলাই।

উপলক্ষও এসে গেল। ন্যাশনাল ডিবেট ফোরাম ওই চিরিরবন্দরে রংপুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগীয় বিতর্ক উৎসব করছে।

রংপুর যাওয়া হবে, আম্মার সঙ্গে দেখা করা যাবে, একই সঙ্গে দেখা হবে চিরিরবন্দরে আমজাদ সাহেবের স্কুল এবং রংপুর বিভাগের ছেলেমেয়েদের বিতর্ক উৎসব। তা হলে পথিকপরান চল, চল সে পথে তুই...

চিরিরবন্দর যাচ্ছি, এ কথা শুনেই সবাই বলতে লাগলেন, কই যাও, আমেনা-বাকী স্কুল? ও তো খুবই নাম করছে। দিনাজপুরে তাদের রেজাল্ট খুব ভালো। গ্রামের ওই স্কুলটি বোর্ডে তৃতীয় হয়! কী বলে! এত জিলা স্কুল আছে, ক্যাডেট কলেজ, ক্যান্ট পাবলিক স্কুল, সবার মধ্যে ওই অজপাড়াগাঁর স্কুলটা হয় তৃতীয়।

সত্যি বলছি, চিরিরবন্দরে না গেলে আমার অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত। মুক্তিযোদ্ধা ডা. আমজাদ হোসেন মা-বাবার নামে ফাউন্ডেশন করেছেন, সেই ফাউন্ডেশন নানা সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করছে, তার মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য হলো আমেনা-বাকী রেসিডেনসিয়াল স্কুল।

থানা সদরে রাস্তার ওপরে তার ক্যাম্পাস। ভেতরে নানা ধরনের গাছপালা। স্কুলঘর। টিনে ছাওয়া টানা ভবন আছে, বহুতল ভবনও আছে। সাড়ে তিন 'শর মতো ছাত্রছাত্রী হোস্টেলে থাকে। আর এগারো 'শর মতো ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। হোস্টেলের ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখি, ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়া বাচ্চামেয়েরা টেবিলে বসে ভাত খাচ্ছে। গ্রাম থেকে আসা বাচ্চা একেকটা, ওদের খাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি। শিশুর মুখের চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে। আবেগে চোখ ছলছল করে ওঠে।

স্কুল প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কাজ। ইট-কাঠ দিয়ে হয়তো ভবন বানানো যায়, কঠিনতর হলো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি পরিচালিত হচ্ছে সুনামের সঙ্গে। বাচ্চারা বৃত্তি পরীক্ষায় ভালো করে, সমাপনী পরীক্ষায় ভালো করে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় সবাই পাস করে, আর বেশির ভাগই জিপিএ-৫ পায়। শুধু লেখাপড়ায় তারা ভালো, তা-ই নয়, তারা খেলাধুলা করে, গ্রামে যায়, পরিবেশ আর মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়। কম্পিউটার ল্যাবরেটরি আছে, দিন-দুনিয়ার খবর রাখে।

টাকাপয়সা হলে অনেকেই অনেক কিছু করেন। কেউ হয়তো দেশ-বিদেশে যান, বিদেশে টাকা পাচার করেন, সুইস ব্যাংকে রাখেন, অস্ট্রেলিয়া-কানাডা প্রবাসী হন, মালয়েশিয়ায় বাড়ি করে দ্বিতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেকেই আছেন এই দেশে, টাকাপয়সা দিয়ে ভালো কাজ করেন, ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একজন চিকিৎসকের টাকা তো সোনালী ব্যাংক থেকে মেরে দেওয়া কোটি কোটি টাকা নয়, একজন একজন করে রোগীকে সেবা দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত টাকা। সেই টাকা দিয়ে নিজের গ্রামে একজন স্কুল বানিয়েছেন, গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল, আর সেটা চলছে সাফল্যের সঙ্গে। আমি বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। একেকটা বাচ্চা একেকটা সম্ভাবনার নাম। এই শিশুদের অনেকেই এসেছে সমাজের একেবারে পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে, এখানে পড়ছে বিনা খরচে।

সবচেয়ে যেটা বড় কথা, এখন আরও আরও স্কুল হচ্ছে চিরিরবন্দরে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনাজপুরে। একজন বললেন, দিনাজপুরে একটা কলেজ হচ্ছে, যেটা সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হবে। বাংলাদেশে একটা কিছু হলে সবাই সেটা অনুসরণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিনেমা হল বানানো শুরু হলো তো সিনেমা হল, চায়নিজ রেস্টুরেন্ট তো চায়নিজ রেস্টুরেন্ট। এখন যদি ভালো স্কুল বানানো, ভালো স্কুল চালানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় বেসরকারি উদ্যোগে, সেটা একটা দারুণ সুসংবাদই বটে।

আর ওই বিতর্ক উৎসবটাতেও দিনাজপুর-রংপুরের নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছে। এই সবই তো প্রশিক্ষণ। একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, অনেকের সঙ্গে মেশা, কথা বলা, মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলা, সবই তো শিক্ষারই অংশ। কবির ভাষায় : 'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাই রে, কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে।'

বাংলাদেশের আরও অনেক জায়গায় এই ধরনের স্কুল আছে। আমরা কুমিল্লা কিংবা সিরাজগঞ্জের বেসরকারি স্কুলের ভালো ফল করার কথা যেমন জানি। এই যে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, শিক্ষার পরশমণির ছোঁয়া পাচ্ছে, এদের জীবন তো বদলে যাবে। রংপুরের পায়রাবন্দের ছোট্ট বালিকাটি রাতের অন্ধকারে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই যে নিষিদ্ধ বিষয় ইংরেজি আর বাংলার পাঠ নিয়েছিল, সে তো কেবল নিজের জীবনটাকে বদলায়নি, সমাজটাকেই বদলে দিয়েছে, সেদিন বেগম রোকেয়া লেখাপড়া করেছিলেন বলেই আজ এই দেশে নারীরা সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে, লড়াই করছে।

বাংলাদেশের ৯০ ভাগের বেশি ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়। ২০ বছর পরে এই দেশের প্রায় সবাই যদি শিক্ষিত হয়, তা হলে আমাদের কৃষকেরা হবেন শিক্ষিত কৃষক, আমাদের শ্রমিকেরা হবেন শিক্ষিত শ্রমিক। সেই সময়টা, দেশটা কি উন্নততর হবে না?

দেশের রাজনীতি আমাদের পিছু টানছে। আমাদের দেশে চলছে বেপরোয়া লুণ্ঠনতন্ত্র। ক্ষমতাবানেরা আইনকানুন, ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির পরোয়া করেন না। কিন্তু পাশাপাশি মানুষ এগিয়ে চলেছে। ব্যক্তি মানুষ কী কী সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে, শিল্প ক্ষেত্রে, ব্যবসায়িক উদ্যোগে। আরব দেশের খেজুরের চাষ হচ্ছে বাংলায়, চাষ হচ্ছে স্ট্রবেরির। মাছে এমন বিপ্লব ঘটে গেছে যে পাঙাশ মাছ এই দেশে এখন সবচেয়ে সস্তা। কত নতুন নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ দেখি এখানে-ওখানে। আর মানুষ ভালো কাজ করছেন। অনেকেই। এবং কাউকে না জানিয়ে।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. ফাউন্ডেশনের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম তো ১০০ কোটি টাকার। এর চেয়ে ভালো বিনিয়োগ আর কিছুই হতে পারে না। মানবসম্পদে বিনিয়োগ, শিক্ষায় বিনিয়োগ। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে অভিবাদন জানাই। প্রথম আলো ট্রাস্টের বৃত্তি পায় অদম্য মেধাবী-রা, যাদের অভিভাবকদের আয় খুবই কম। কিন্তু ওই শিক্ষার্থীরা, দেখা যাচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের পরীক্ষাগুলোতেও ভালো করছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। ভালো ভালো উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ছে। এরা নিজেদের জীবনটাকেই শুধু বদলাবে না, চারদিকের মানুষের জীবনও বদলে দেবে। আমি জানি একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসেবক হাজি আবুল হাশেমের কথা। তিনি অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠাই শুধু করেননি, খবরের কাগজে কোনো শিক্ষার্থীর দুর্দশার খবর ছাপা হলে গোপনে সেখানে ছুটে যান, তার জন্য একটা স্থায়ী কিছু করে দেয়ার উদ্যোগ নেন, আর ওই শিক্ষার্থীকে বলেন, বড় হয়ে তুমি অন্তত একজন ছাত্রকে লেখাপড়া করতে সাহায্য কোরো।

আমাদের সহপাঠীদের বুয়েট ৮৯ কাব বলে একটা সংগঠন আছে। তারাও প্রায় সবার অগোচরে একটা কাজ করছে। কল্যাণপুর পোড়া বস্তিতে তারা একটা ছোট্ট ডে-কেয়ার সেন্টার চালাচ্ছে। ওই বস্তির মায়েরা অনেকেই গার্মেন্টসে বা বাসাবাড়িতে কাজ করেন। তাঁদের বাচ্চারা দিনের বেলা থাকবে কোথায়? একদিন বিকেলে ওই ডে-কেয়ার সেন্টারে গিয়ে দেখি, একটা ঘরে ১০টা বাচ্চা সবুজ রঙের জামা পরে আরামে ঘুমুচ্ছে। ওরা সকাল সাতটায় আসে, সন্ধ্যা সাতটার পরে ফেরে। ওদের খাওয়ানো, পরানো আর লেখাপড়ার কাজটা করে এই সেন্টারটি। চিত্রনায়িকা ববিতা এই কার্যক্রম উদ্বোধন করে দিয়েছিলেন। এ তো গেল ভালো খবর। খারাপ খবরটা পেলাম ওই বস্তিতে গিয়ে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে বস্তির যে ছেলেমেয়েরা, তাদের অনেকেই ভালোমতো পড়তে পারে না, লিখতে পারে না। মা গার্মেন্টসে চাকরি করেন, হয়তো তিন হাজার টাকা পান মাসে। তাঁকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়-য়া বাচ্চাকে গৃহশিক্ষের কাছে পড়ানোর জন্য খরচ করতে হয় মাসে হাজার-বারো 'শ টাকা।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে একটা বড়সড় আন্দোলন কিন্তু শুরু করা দরকার। ঢাকা শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় কী হচ্ছে, গ্রামেগঞ্জে কী হচ্ছে, শহরের সমাজনেতারা তার কোনো খবর রাখছেন কি?

আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ তার মানুষ। প্রায় এক কোটি লোক এখন প্রবাসী, প্রতিদিন তিন হাজার মানুষ বিদেশে যাচ্ছে কাজের সন্ধানে, এই সংখ্যাটা বাড়বে, কারণ একজন বিদেশে গেলে তার আত্মীয়স্বজনকেও নিয়ে যাবে, কাজেই আগামী ১০ বছর পরে এই দেশের তিন কোটি লোকের প্রবাসী হওয়ার কথা। আর এখন ৮০ হাজার ছেলেমেয়ে মাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পাচ্ছে। এই লাখ লাখ ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, সেই দেশটার অগ্রগতি কে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?

আমাদের রাজনীতিতে আগামী দুই বছরে আপনি কোনো সুসংবাদ আশা করেন না, আমি জানি। কিন্তু ২০ বছর পরে এই দেশটা যে একটা আলোকিত উন্নত দেশ হবে, সেটা কিন্তু একটা গাণিতিক বাস্তবতা। কারণ, আজকের শিক্ষার্থীরা তখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। শিক্ষার বিষয়ে আমাদের আরও মনোযোগী হতে হবে, বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, আর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে একটা আন্দোলন শুরু করতে হবে। তা হলে দেশটার উন্নতি কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

১৫.০৭.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুয়েটের দুই স্যার যা করতে পারেন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আবারও সেই পুরোনো গল্পটিই বলতে হয়। কাজির কাছে বিচার এসেছে। একটা শিশুকে দুজন নারী নিজের সন্তান বলে দাবি করছেন। কেউই দাবি ছাড়েন না। কাজি বললেন, আনো তরবারি, দু টুকরো করো বাচ্চাটাকে, তারপর দিয়ে দাও দুজনকে দুই টুকরো। একজন নারী বললেন, দরকার নেই বাচ্চাকে কাটার, আপনি ওকেই বাচ্চা দিয়ে দিন। কাজি বললেন, ইনিই হলেন প্রকৃত মা। একেই বাচ্চা দিয়ে দাও। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোরতর অচলাবস্থা। শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থীরা একযোগে আন্দোলন করছেন। তাঁরা চান বর্তমান উপাচার্য নজরুল ইসলাম ও সহ-উপাচার্য হাবিবুর রহমানের অপসারণ। (প্রথমে অবশ্য দাবিটি ছিল পদত্যাগ, এখন এটা অপসারণে এসে দাঁড়িয়েছে।) বুয়েটের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যা বুঝতে পারলাম, প্রায় ৯০ শতাংশ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থী এখন এই দুজনের পদত্যাগ চান এবং এই লক্ষ্যে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। এই দাবিতে শহীদ মিনারে যে সমাবেশ হয়েছে, তাতে যে বিপুল উপস্থিতি, তাঁদের শপথ নেয়ার যে দীপ্ত ভঙ্গি গণমাধ্যমে দেখলাম, তাতে মনে হয়, এই দুজনের পদত্যাগই এখন সমস্যার সবচেয়ে সহজ এবং হয়তো বা একমাত্র সমাধান। আর সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষকেরা এই দুজনের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে প্রশাসনিক পদ থেকে, ডিন বা পরিচালকেরা নিজ নিজ পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। যদি কোনো উপাচার্য বা সহ-উপাচার্যের ওপর তাঁর সহকর্মীদের আস্থা না থাকে, তাহলে তাঁর নিজেরই সেই পদ থেকে সরে যাওয়া উচিত। এটা নিয়ম বা অনিয়মের প্রশ্ন নয়, এটা হলো স্বাভাবিক সম্মানবোধের প্রশ্ন, নৈতিকতার প্রশ্ন, কাণ্ডজ্ঞানের প্রশ্ন।

মাননীয় উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের উদ্দেশে বলা যায়, আপনারা কোনো অন্যায় বা অনিয়ম করেছেন কি করেননি, সেটা না হয় ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকুক, আপাতত পদ দুটো থেকে সরে যান। বলুন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো চাই, এর শিক্ষার্থীদের মঙ্গল চাই, তাঁদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত না হোক, সেটাই আমাদের কাম্য, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভালো চাই, তাঁরা যেহেতু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাস্থা দেখিয়েছেন, তাই প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা পদত্যাগ করছি। এটাই হতে পারে বুয়েটের বর্তমান সংকটের সহজতম ও কার্যকর সমাধান।

বুয়েটে এই পরিস্থিতির উদ্ভব কীভাবে হলো, এটা কিন্তু বুয়েটের বাইরের মানুষকে বোঝানো একটু কষ্টকরই হবে। কারণ, যে ঘটনাগুলো শিক্ষকদের কিংবা অন্যদেরও ক্ষুব্ধ করেছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেসব কর্মকাণ্ড হরহামেশাই ঘটছে। কিন্তু বুয়েটে এসব ঘটে না। সে কারণেই বুয়েট দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

ঘটনার শুরু সহ-উপাচার্যের পদ সৃষ্টি এবং সেই পদে নিয়োগ নিয়ে। সেটা প্রায় বছর তিনেক আগের কথা। তখন অধ্যাপক সফিউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি কোনো দলের লোক নন। হয়তো সে কারণেই একজন সহ-উপাচার্যের পদ সৃষ্টি করা হলো, আর সেই পদে ৫৮ জনকে ডিঙিয়ে একজনকে নিয়োগ দেয়া হলো। বুয়েটে সব সময়ই উপাচার্য পদে জ্যেষ্ঠতা ও একাডেমিক গুণাবলি বিচার করেই নিয়োগ দেয়া হয়ে আসছে। কিন্তু এবার যাঁকে করা হলো, তিনি জ্যেষ্ঠতার বিচারে বলা যায় কনিষ্ঠ এবং তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা। এখানেই বাইরের লোকজন বলবেন, বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতাকেই যে সহ-উপাচার্য নিয়োগ করা হবে, সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? অন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাভাবিক হলেও বুয়েটের ঐতিহ্য অন্য রকম। বুয়েটের বেলায় রীতি হলো, এ ধরনের পদায়নে জ্যেষ্ঠতা বিচার করা হয়ে থাকে সবার আগে। কাজেই বুয়েটের শিক্ষকেরা এই নিয়োগের প্রতিবাদ করেছিলেন নানাভাবে।

স্মরণ করতে চাই এবং করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের কথা। সেখানে দলীয়করণের জন্য পূর্ববর্তী বিএনপি জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল, 'যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হবে' (৫.৬)। বিগত নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী হওয়ার পর আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (এখন বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র) এক সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। সেখানে তিনি হাসিমুখে এই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, দলীয় পরিচয় বিবেচনা করে নয়, যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতেই নিয়োগ ও পদোন্নতি হবে।

সরকার এই অঙ্গীকার কতটুকু রক্ষা করছে, সেটা সবার জানা। নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় বিবেচনা করার ফল কী হয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থা হলো তার একটা স্পষ্ট উদাহরণ। প্রথমে সহ-উপাচার্য নিয়োজিত হলেন দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে। এক বছর পর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম উপাচার্য নিয়োজিত হলেন, যাঁর দলীয় আনুগত্যের কোনো তুলনা হয় না। বুয়েটের একজন খ্যাতিমান অধ্যাপকের সঙ্গে দুই দিন আগে আমার দেখা। আমি বললাম, 'বুয়েটের এই সমস্যার সমাধান আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি। নজরুল ইসলাম স্যারের চেয়ে কঠিন একজন আওয়ামী লীগারকে ভিসি বানিয়ে দিলেই তো হয়।' সেই অধ্যাপক হেসে বললেন, 'সে রকম কাউকে পাওয়া কঠিন হবে, নজরুল ইসলাম স্যারের চেয়েও কঠিন আওয়ামী লীগার পাওয়া সত্যি কঠিন।' কিন্তু অধ্যাপক নজরুল ইসলাম যেহেতু জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের একজন, কাজেই তাঁর নিয়োগের সময় তেমন কোনো আপত্তি ওঠেনি।

তখন ওঠেনি, এখন উঠল কেন? নানা ধরনের অনিয়ম ঘটেছে, যা অন্য প্রতিষ্ঠানে হয়তো স্বাভাবিক, বুয়েটের জন্য অগ্রহণযোগ্য। ছাত্রলীগের একজন ছাত্র একটা বিষয়ে পরীক্ষা দেয়নি বলে অকৃতকার্য হবে, এটাকে পরিবর্তন করার একটা বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে, তাতে অনিয়ম হয়েছে বলে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। http://www.scribd.com/doc/99422269/Report এই সাইটে সেই তদন্ত প্রতিবেদন আছে, আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন। বা বঙ্গবন্ধু পরিষদের একজন নেতাকে রেজিস্ট্রার বানানোর জন্য ভূতাপে নামের একটা অদ্ভুত পদোন্নতি দেয়া হয়েছে, যার মানে, অনেক আগেই তাঁর পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্যতা ছিল, তাই একধাপ পদোন্নতি হলো। তারপর তাঁর আবার পদোন্নতি পাওয়া উচিত ছিল, কাজেই তাঁকে আবার পদোন্নতি দেয়া হলো। এখন তিনি রেজিস্ট্রার বা ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদের যোগ্য হলেন, তাঁকে আবার পদোন্নতি দেয়া হলো। ব্যাপারটা বেশ হাস্যকর আর খুব চোখে লাগার মতো। এ ধরনের ঘটনা ছোটখাটো নিয়োগের ক্ষেত্রেও হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। বুয়েট তিনটি ক্ষেত্রে সততা ও সুনীতি বজায় রেখে আসছে—এক. শিক্ষক নিয়োগ, দুই. পরীক্ষার ফল, তিন. ভর্তি পরীক্ষা। বিভিন্ন কমিটিতে যাঁদের নেয়া হয়, তাঁদের প্রধান যোগ্যতা বলে গণ্য করা হয় জ্যেষ্ঠতা। এই ঐতিহ্য এবার ভীষণভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছিল বলে শিক্ষকেরা অভিযোগ করছেন। এভাবে একটা-দুটো ঘটনা থেকে ১৬টা অভিযোগ, তা থেকে ক্ষোভ, শেষে ক্ষোভ পরিণত হয়েছে বিক্ষোভে। এখন বুয়েটে তীব্র আন্দোলন চলছে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে।

উপাচার্য যা বলছেন, তাতে যে যুক্তি নেই, তা-ও বলব না। আরেকটা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল, যদিও সেই তদন্ত কমিটিকেই শিক্ষক সমিতি গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। কাজেই তাদের প্রতিবেদনও তারা মানছে না। উপাচার্য বলছেন, আচ্ছা, তাহলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করা হোক, দোষ পাওয়া গেলে তারপর পদত্যাগ। বিনা দোষে কেন আমি পদত্যাগ করব! কিন্তু শিক্ষক সমিতি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি চায় না। তারা চায় উপাচার্য আর সহ-উপাচার্যের পদত্যাগ।

এখন আমরা স্মরণ করব হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট লরেন্স সামারসের পদত্যাগের ঘটনাটা। ওই ভদ্রলোক খুবই ক্ষমতাবান ছিলেন। ছিলেন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ট্রেজারি সেক্রেটারি। ওয়াশিংটন পোস্ট, ওয়াল স্ট্রিট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জার্নাল-এর মতো পত্রিকা তাঁর সমর্থক ছিল। কিন্তু হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘটনা ২০০৬ সালের। এর আগে ২০০৫ সালে একটা একাডেমিক বক্তৃতায় নারীরা কেন বিজ্ঞানে উচ্চপদে নেই, তার কারণ হিসেবে নারীদের বিপক্ষে একটা উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণায় ও উচ্চপদ গ্রহণে মেয়েদের 'অ্যাপটিচুড' নেই। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এই কথাকে নারীবিদ্বেষী হিসেবে বর্ণনা করে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন। শিক্ষকদের সভায় তাঁর পদত্যাগের দাবি ভোটে তোলা হলে সেটাই গৃহীত হয়। লরেন্স সামারস তাঁর বক্তৃতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। হার্ভার্ডের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীরাও তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর সহকর্মীরা বলছেন তাঁর পদত্যাগ করা উচিত, কাজেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অন্যান্য যোগ্যতার শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও এই অর্থনীতিবিদ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য সেই দৃষ্টান্ত মাথায় রেখে সরে যেতে পারেন। আর এ ঘটনার শিক্ষা হলো—দলীয়করণ, দলীয় আনুগত্য শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনে। দলীয় বিবেচনা থেকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্বশীল পদ দেয়া হলে তিনি তাঁর অযোগ্যতা ঢাকতে খুব বেশি দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতি দিয়ে পরিচালিত হন, সেটা বিপর্যয় ডেকে আনে। সেই বিপর্যয় ঢাকতে তিনি অধিকতর দলীয় কর্মীর মতো আচরণ করতে থাকেন, সেটা আরও বড় বিপদই ডেকে আনে প্রতিষ্ঠানের জন্য, তাঁর নিজের জন্য, এমনকি দল ও সরকারের জন্য।

বুয়েটে যাঁরা এখন ভিসি-বিরোধী আন্দোলন করছেন, তাঁদের অনেকেই ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগ করেছেন। এঁদের অনেকেই আওয়ামী লীগের সমর্থক, এটা আমি ব্যক্তিগতভাবেই জানি। কিন্তু এঁরা সবাই বুয়েটের উজ্জ্বল ভাবমূর্তির পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চান। আর ভিসি হওয়ার যোগ্য জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষই বেশি।

এটাকে দলীয় শক্তির মহড়ার ক্ষেত্র হিসেবে না দেখে প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দ, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি প্রধান বিবেচনা হিসেবে নেয়া উচিত। জেদাজেদি নয়, সংকটের সমাধান চাই। সে জন্যই সেই কাজির বিচারের গল্প, নিজ সন্তানকে তরবারি দিয়ে দু টুকরো না করে প্রতিষ্ঠানটির স্বার্থেই ত্যাগের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এবার হয়তো ত্যাগটা উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকেই করতে হবে। আর সেটা হলো, পদত্যাগ।

২০.০৭.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় আমাদের আশা?

বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য কী? ঢাকা থেকে বেরিয়ে গ্রামগঞ্জের দিকে গেলে কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে আপনাকে? আমার কাছে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর মনে হয় গ্রামের ছেলেমেয়েদের দল বেঁধে স্কুলে যাওয়ার দৃশ্য। আলপথে সবুজ ধানখেতের পাশ দিয়ে, নৌকায়, পাহাড়ি পথে, বিস্তীর্ণ পাথার পেরিয়ে দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, আর স্কুল থেকে ফেরে। পাঁচ বছরের শিশু, কোথাও কোথাও আরও কম বয়সী কেউ বই বগলে স্কুলে যাচ্ছে। যেতে যেতে হাঁসের দলের পেছনে পড়েছে, তার নাক দিয়ে সর্দি পড়ছে, সে বড় বড় গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে হয়তো কোনো কানাবগির দিকে, হয়তো একটা চিলের ছোঁ মেরে মুরগির বাচ্চা ধরে নেয়ার দৃশ্যের দিকে। আমি এ ধরনের দৃশ্য দেখে খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। সরকারি হিসাবমতে, বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়। এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে প্রায় এক কোটি নব্বই লাখ ছেলেমেয়ে। আর বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশি। বেসরকারি হিসাবেও ৯০ শতাংশের বেশি ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে যাওয়ার হারও কমেছে, এখন সরকারি হিসাবে সেটা ২৫ শতাংশ। এই যে কোটি কোটি ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, ওরাই আমাদের ভরসা।

এ বছর প্রায় ১০ লাখ ছেলেমেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষা দিয়েছে, সাত লাখেরও বেশি উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়েরা ভালো করেছে ছেলেদের চেয়ে বেশি।

আর আছে অদম্য মেধাবীরা। বাবা তিস্তা নদীর মাঝি, সারা রাত মাছ ধরেন, কখনো কখনো ছেলেকেও যেতে হয় বাবার সঙ্গে নৌকায়। যে কটা মাছ পান, সকালে বিক্রি করেন, তারপর চাল কেনেন। ওই ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রংপুরে, সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ বছর আশি হাজারের মতো ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ রকম কত ছেলেমেয়ে আছে, গ্রামেগঞ্জে, ঘোরতর প্রতিকূল পরিবেশে থেকে যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিপিএ-৫ পেয়েছে। পত্রিকার পাতায় আমরা এখন পড়ছি উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পাওয়া অনেক সংগ্রামী শিক্ষার্থীর কথা, যারা উঠে এসেছে সমাজের পিছিয়ে পড়া বা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি থেকে। ষাট হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে।

শিক্ষা একটা আশ্চর্য পরশপাথর। এর স্পর্শে লোহা কিংবা কাঠ–সবই সোনা হয়ে যেতে পারে। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ নিজ বিষয়ে অনেক ভালো করবে। কেউ বড় বিজ্ঞানী হবে, তার গবেষণা দিয়ে বিশ্বসভ্যতাকেই নেবে এগিয়ে। কেউ-বা হবে বড় লেখক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, আর হবে নেতা, যে নেতা আমাদের সমাজটাকে, রাষ্ট্রটাকে এগিয়ে নেবে। অনেক বড় হিমালয় পর্বতমালা থেকে একটা এভারেস্ট, একটা অন্নপূর্ণা তো দাঁড়িয়ে যাবেই। কিন্তু সবাই তো আর সত্যেন বোস হবে না, এফ আর খান হবে না, অধ্যাপক ইউনূস হবে না। অনেকেই বিদ্যালয়ের পরে আর পড়বে না, অনেকেই পড়বে না কলেজের পরে। কিন্তু একবার যে পড়তে শিখেছে, লিখতে শিখেছে, হিসাবপাতি করতে শিখেছে, আর মোবাইল ফোনে টেক্সট লিখতে জানে, আপনি তাকে আর ফেরাতে পারবেন না। সে একটা কিছু করবেই। অনেকেই চলে যাবে বিদেশে, বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ এখন প্রবাসী। এর মধ্যে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণির যারা, তারা বিদেশে গিয়ে নাগরিকত্ব নিচ্ছে, সে জন্য হয়তো দেশের টাকা বিদেশেও পাঠাচ্ছে। আমাদের বড়লোকেরাও, আমাদের দুর্নীতিবাজ নেতারাও শুনি হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু গ্রামগঞ্জ থেকে বিদেশে যাওয়া কৃষকের সন্তানেরা দেশে টাকা পাঠাচ্ছে, এটাই আমাদের বিদেশি মুদ্রার প্রধান উৎস। এই যে এক কোটি নব্বই লাখ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, বাংলামাধ্যমে পড়ছে–এদের অনেকেই বিদেশে চলে যাবে। এরা দেশের জন্য টাকা পাঠাবে, পাঠাবে উন্নত জ্ঞান, প্রযুক্তি আর ভাবনা। আর যারা দেশে থাকবে, নানা সৃষ্টিশীল উদ্যোগ দিয়ে তারা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করবে। কী বিচিত্র কাজই না হচ্ছে দেশে। মাছ চাষে বিপ্লব ঘটে গেল, পোলট্রিতেও। কৃষিতে বিপ্লব চলছে, নতুন নতুন ধানের প্রজাতি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, ফলন বাড়ছে, আবার কত ধরনের শস্য উৎপাদনের চেষ্টাই না চলছে। স্ট্রবেরি থেকে শুরু করে বাওকুল, ভুট্টা থেকে কলা। ব্যবসায়িক উদ্যোগ, শিল্পোদ্যোগের অভিনবত্বেরও কোনো জুড়ি নেই। যে ছেলে বা মেয়ে একবার শিক্ষার আলো পেয়েছে, সে যদি কৃষকও হয়, উন্নততর কৃষক হবে; সে যদি মা হয়, যোগ্যতর মা হবে। এবং বাস্তবতা হলো, বাপের মতো এই ছেলে আর তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে যাবে না, হাল বাইতে মাঠে যাবে না। যদি যায়, সে ট্রাক্টর নিয়ে যাবে, উন্নততর কৃষি প্রবর্তন করবে, উন্নত মৎস্য চাষ ও বিপণনে নিয়োজিত হয়ে সে যেমন নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কপাল ফেরাবে, তেমনি ঘোরাবে দেশের ভাগ্যের চাকা। কাজেই বাংলাদেশ ক্রমাগতভাবে ভালো করছে, এই ভালোর চাকাকে আর পেছন দিকে ফেরানো যাবে না, যদি শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা মনোযোগ দিই। সত্য বটে, সবার শিক্ষা মানসম্মত নয়। সত্য বটে, অনেকেই এখনো বিদ্যালয়ে যায় না, গেলেও শেষ পর্যন্ত থাকে না। এবং এই শিক্ষার একটা শাখা হওয়া উচিত একেবারেই বৃত্তিমূলক, যে শ্রমিকটি আজ বিদেশে যাচ্ছে কাজের সন্ধানে, সে যদি একটু প্রশিক্ষিত হয়ে যায়, ভাষাটা, কারিগরি কৌশলটা শিখে যায়, সে উন্নততর কাজ পাবে, সে শ্রমশোষণ বা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হবে না। সেদিকে নিশ্চয়ই শিক্ষাভাবুকেরা নজর দেবেন।

কিন্তু যা আছে, যতটুকু দেখছি, তাতেই বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিতে পারি। নজরুল বা রবীন্দ্রনাথ হওয়ার জন্য এমএ-বিএ পাস করতে হয় না। রফিক বা নাসিরের মতো ক্রিকেটার হওয়ার জন্যও নয়। শিক্ষা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত, শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা থেকে একটা মানুষের ভেতরের সম্ভাবনা জেগে উঠতে পারে। প্রতিটি মানুষের ভেতরেই মোম আছে, সলতে আছে, শিক্ষা শুধু অগ্নিসংযোগের কাজটা করে দেয়। বাংলাদেশের বহু শিল্পোদ্যোক্তা আছেন, যাঁরা হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করছেন, যাঁদের পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। তাঁরা খুব যে লেখাপড়া জানেন, তা নয়। ব্রিটিশ আমলে আমাদের শিক্ষা আমাদেরকে কেরানি বানাত, এখনকার শিক্ষা আমাদের বিশ্বময়দানে লড়াই করার উপযুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে তৈরি করছে। কাজেই আজ থেকে বিশ বছর পরে যখন আজকের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে পড়া ছেলেমেয়েরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, তখনকার বাংলাদেশ হবে একটা উন্নত বাংলাদেশ, আলোকিত বাংলাদেশ। এটা আমার চ্যালেঞ্জ।

কিন্তু মানুষের এই যে বিপুল সৃজনশীলতা, এই মহাকর্মোদ্যোগ, এর সামনে সবচেয়ে বড় বাধা আমাদের দ্বন্দ্বময় রাজনীতি এবং আমাদের শাসকশ্রেণির বেপরোয়া লুণ্ঠনবৃত্তি। তারা কোনো আইন-কানুন মানে না, তাদের কোনো লজ্জাশরম নেই। তারা একটার পর একটা এমন কাজ করে যে লজ্জায় পুরো জাতির মাথা কাটা যায়। আর তারা এমনি নির্লজ্জ যে সেই সব লজ্জাজনক অপকর্মের পক্ষে সাফাই গাইতে থাকে। তারা দেশের টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করে এবং কখনো কখনো সেই সব ধরা পড়ে, বিদেশি মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয় এবং বিদেশে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার হয়। দেশের টাকায় চারটা পদ্মা সেতু হতে পারে, যেকোনো মহৎ কাজে দেশের ডাকে মানুষ, টাকা-পয়সা তো সামান্য ব্যাপার, জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু দেবটা কাকে? কিসের জন্য? আমি কি শেয়ালের হাতে আমার মুরগির বাচ্চাকে তুলে দেব দেশ আত্মত্যাগ চায় বলে? আমাদের দেশে দুর্নীতি সেই কৌটিল্যের আমলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, মোগল আমলে হয়েছে, কোম্পানি আমলে হয়েছে, পাকিস্তান আমলেও হয়েছে। সেটা নতুন কিছু নয়, কিন্তু আমরা নিষ্ঠুর হলাম কবে থেকে? আমরা গুম করি, শুধু যাকে গুম করতে চাই তাকে নয়, তার ড্রাইভারকে গুম করে ফেলি কী কারণে? এত নিষ্ঠুর এত অমানবিক কবে থেকে হলাম আমরা? আর আমাদের কথার মধ্যে কোনো সংগতি নেই, সংহতি নেই, সমন্বয় নেই, ধারাবাহিকতা নেই। আমরা কাচের ঘরে বসে অন্যের প্রতি ঢিল ছুঁড়ছি। গত গদ্যকার্টুনে আমি কৌতুকের বই থেকে রণকৌশল-সংক্রান্ত মারফির সূত্র উল্লেখ করেছিলাম–'যখন তুমি দেখো যে শত্রু তোমার নাগালের মধ্যে, নিশ্চিত জানবে যে তুমিও তার নাগালের মধ্যে।' আমরা যে ত্যাগ করব, কিসের জন্য করব? কার হাতে দানের টাকা তুলে দেব? তুমি ঠিকমতো দাবার ঘুঁটি চালতে পারো না, অথচ দাবা খেলার দায়িত্ব নিয়ে বসে আছ, আর তোমার ভুল, তোমার অন্যায়, তোমার চুরির কারণে আমাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তা তো হয় না।

এই দুই বিপরীত বাংলাদেশ এখন আমাদের সামনে। এই লেখাটা আমি লিখছি আসলে প্রচণ্ড হতাশা থেকে। আমরা কি অল্পেকটু ভালোভাবে শাসিত হওয়ার যোগ্যতা রাখি না? কী সুযোগটাই না এই মহাজোট সরকার লাভ করেছিল দেশটাকে উন্নয়নের মহাসড়কে তুলে দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট করার। একগুঁয়েমি, হীনম্মন্যতা, কূপমণ্ডূকতা, লোভ, দুর্নীতি, ব্যর্থতা, অযোগ্যতা আমাদের সব সম্ভাবনাকে কি বিনষ্ট করল না?

আমাদের সম্ভাবনা আমাদের মানুষ। আমাদের আশা আমাদের তরুণ প্রজন্ম। আমাদের আশা এক কোটি নব্বই লাখ ছেলেমেয়ে, যারা বনবাদাড় পেরিয়ে, হাঁটুজল ভেঙে, আলপথ মাড়িয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। জামালপুরের একটা গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়ার জন্য পাতিল হাতে সাঁতরে খাল পার হতো, আমরা প্রথম আলোয় সেই খবর পড়েছিলাম।

আমাদের নতুন প্রজন্ম আলোর সন্ধানে বেরিয়ে ঘরে ফিরে যাবে না, পাতিল হাতে করে খালবিল সাঁতরে হলেও তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে। ওইখানেই আমাদের আশা।

১৩.০৮.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু কী বলেছেন, আমরা কী করছি!

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অভিন্ন। তাঁর জন্মই হয়েছিল তিনি এই দেশটাকে স্বাধীন করবেন বলে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সমস্তটা জীবন একটা চেষ্টাই করেছেন, একটাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা–বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলার মানুষের মুক্তি।

১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান হয়েই গেল, শেখ মুজিব কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা ছাত্রাবাসে জড়ো হওয়া ছাত্রকর্মীদের উদ্দেশে বললেন, এই স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়। আমাদের যেতে হবে পূর্ব বাংলায়, নতুন করে শুরু করতে হবে সংগ্রাম।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান কথাটাও বলতে চাইতেন না। তিনি একে ডাকতেন পূর্ব বাংলা বলে, তারপর বলতেন বাংলাদেশ। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি বলেছিলেন, 'ওরা পূর্ব বাংলা নামের পরিবর্তে "পূর্ব পাকিস্তান" নাম রাখতে চায়। আমরা অনেবার দাবি জানিয়েছি যে আপনারা এটাকে বাংলা বলে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে ঐতিহ্য।'

অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন, 'শেখ সাহেবকে প্রশ্ন করি, বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এলো?'

'শুনবেন?' তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে।'

শেখ মুজিব এবং অন্যরা সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন, ১৯৪৮ সালে বড় ভাষা আন্দোলন হয়, মুজিব গ্রেপ্তার হন। এরপর তিনি বারবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। গোয়েন্দারা তাঁর কাছে কারাগারে গেছে, বলেছে, বন্ডসই দিয়ে মুক্তি নিন। তিনি বলেছেন, বন্ডসই দিয়ে মুক্তি তিনি নেবেন না। সেই সব গোয়েন্দা রিপোর্ট এখন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, এই বন্দীর মনোবল খুবই কঠোর। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফরিদপুর কারাগারে যখন তিনি অনশন করেন, তখন তাঁর হার্টে অসুখ। ওজন দ্রুত কমে আসছে। তিনি বুঝতে পারছেন তিনি মৃত্যুর দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাবিত হচ্ছেন। তখনো তিনি ভেবেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মরার মধ্যেও শান্তি আছে, গৌরব আছে। এতবার তিনি জেলে গেছেন যে, তাঁর সন্তান কামাল তাঁকে ছোটবেলায় দেখেছে খুব কম। তাই তো সে তার বড় বোন শেখ হাসিনাকে বলেছিল, খুব ছোটবেলায়–'আপা, তোমার আব্বাকে আব্বা বলে ডাকি?' শেখ মুজিব তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমারও আব্বা।" কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন ও আর সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়। আমি যখন জেলে যাই, তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এ রকম কতগুলো উপলব্ধির কথা লিখেছেন, যা আমাদের চিরকাল পথ দেখাতে পারে। ওই বই পড়ি, আর ভাবি, বঙ্গবন্ধু কী বলেছিলেন, আর তার অনুসারীরা কী করছেন?

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব নেতাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তখন মুজিব একবার করাচিতে গিয়ে খাজা নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। শেখ মুজিব তাঁকে বলেন, 'আওয়ামী লীগ বিরোধী পার্টি। তাকে কাজ করতে সুযোগ দেয়া উচিত। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।' এই উপলব্ধি ১৯৫২ সালের, যখন শেখ মুজিবের বয়স মাত্র ৩২। ৩২ বছরে মুজিব যা উপলব্ধি করেছেন, আমরা কবে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারব?

শেখ মুজিব একবার আবুল হাশিম সাহেবের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। কলকাতায় আবুল হাশিম সাহেবের কাছে ছাপাখানা ছিল, যেটা মুজিবেরা চাঁদা তুলে গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪৭-এ হাশিম সাহেব সেই ছাপাখানা বিক্রি করে দেবেন। সবাই মুজিবকে ধরল, 'তুমি গিয়ে বলো, তাহলে তিনি আর প্রেস বিক্রি করবেন না।' সবার অনুরোধে মুজিব আবুল হাশিম সাহেবকে কঠোর ভাষায় বলে এলেন, 'প্রেস বিক্রি করতে গেলে আমি বাধা দেব, দেখি কে আসে এই মিল্লাত প্রেস কিনতে?' আবুল হাশিম সাহেব দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি খাওয়াদাওয়া ত্যাগ করেছিলেন। মুজিব তাঁর কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। মুজিব তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'আমি যাওয়াতে তিনি খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ভিন্নমত হতে পারি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, সেটা তো ভোলা কষ্টকর। আমার যদি কোনো ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি, সেটা স্বীকার করতে কোনো দিন কষ্ট হয় নাই। ভুল হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংশোধন করে নেব, মানুষেরই তো ভুল হয়ে থাকে।' এই কথাটা শেখ মুজিব বলেই বলতে পারেন। আর আমরা দেখি, আজকের নেতা-নেত্রীরা কোনো কিছু ভুল করেন না। কোনো ভুল তাই তাঁদের স্বীকারও করতে হয় না। কোনো ভুলের সংশোধনীও তাঁদের করতে হয় না।

অসাধারণ একটা পর্যবেক্ষণ মুজিব করেছেন আমাদের সম্পর্কে। 'পরশ্রীকাতরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে আছে। বোধ হয় দুনিয়ার কোনো ভাষায়ই পাওয়া যাবে না "পরশ্রীকাতরতা"। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে "পরশ্রীকাতর" বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই, ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না।'

ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকের কথা। লীগ মন্ত্রিসভা তখন অবিভক্ত বাংলায়। এমএলএ কেনাবেচা হচ্ছে। তরুণ মুসলিম লীগ কর্মী মুজিবের ওপর দায়িত্ব পড়ল এমএলএদের পাহারা দিয়ে রাখা, যাতে তাঁরা টাকা নিয়ে মত পাল্টাতে না পারেন। মুজিব তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'এর পূর্বে আমার ধারণা ছিল না যে, এমএলএরা এইভাবে টাকা নিতে পারে। এরাই দেশের ও জনগণের প্রতিনিধি! আমার মনে আছে, আমাদের ওপর ভার পড়ল কয়েকজন এমএলএকে পাহারা দেবার, যাতে তারা দলত্যাগ করে অন্য দলে যেতে না পারে। ...একজন এমএলএকে মুসলিম লীগ অফিসে আটকানো হল। তিনি বার বার চেষ্টা করেন বাইরে যেতে। কিছু সময় পরে বললেন, "আমাকে বাইরে যেতে দিন, কোনো ভয় নাই। বিরোধী দল টাকা দিতেছে, যদি কিছু টাকা নিয়ে আসতে পারি আপনাদের ক্ষতি কি? ভোট আমি মুসলিম লীগের পক্ষেই দিব।" আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। বৃদ্ধ লোক, সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া কিছু জানেন, কেমন করে এই কথা বলতে পারলেন আমাদের কাছে? টাকা নেবেন একদল থেকে অন্য দলের সভ্য হয়ে, আবার টাকা এনেও ভোট দেবেন না। কতটা অধঃপতন হতে পারে আমাদের সমাজের!'

হায় বঙ্গবন্ধু মুজিব, আপনি যদি জানতেন, এমএলএরা চিরটাকালই টাকা নিয়েছে! এখন এমন এমপিও আছেন, খবরের কাগজে পড়েছি, যিনি এলাকার বেকার যুবকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন একই পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য, টাকা নিয়েছেন, কিন্তু চাকরিও দেননি।

আকবর আলি খান তাঁর পরার্থপরতা বইয়ে 'শুয়োরের বাচ্চাদের অর্থনীতি' নামের একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। একজন ইংরেজ বিচারককে একজন ভারতীয় বলেছিল, দুর্নীতিবাজ অফিসার দুই রকমের। একদল আছে, ঘুষ খেয়ে কাজ করে। আরেক দল আছে শূয়োরের বাচ্চা। তারা ঘুষ নেয়, কিন্তু কাজ করে না।

থাক, আর বেশি কিছু বলতে চাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু কারাগারে যখন অনশন করেন, তখন তাঁর সঙ্গে অনশনে যোগ দেন মহিউদ্দিন আহমদ। মহিউদ্দিন ছিলেন মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের ঘোরতর বিরোধী, অর্থাৎ মুজিবদের বিরোধী পরে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন জোগানোর। কাজেই মুজিবভক্ত নেতা-কর্মীরা কেউ চায়নি, মহিউদ্দিন ও মুজিব একসঙ্গে অনশন করুন। শেখ মুজিব লিখেছেন, 'মানুষকে ব্যবহার, ভালবাসা ও প্রীতি দিয়েই জয় করা যায়, অত্যাচার, জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না।'

এইভাবে মুজিব অনেক শত্রুকে তাঁর মিত্রে পরিণত করেছিলেন। এটাই তো রাজনৈতিক কৌশল। আমার শত্রুকে আমি বন্ধুতে পরিণত করব, অন্তত তাকে নিরপেক্ষ বানিয়ে ছাড়ব, বন্ধুকে করে তুলব আরও বন্ধু। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে কী দেখছি আমরা? নিরপেক্ষকে শত্রুতে পরিণত করা হচ্ছে, বন্ধুকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। অকারণ শত্রুতা অকারণ পরশ্রীকাতরতা আমাদের বহু সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একবার এক সভায় মওলানা ভাসানীকে সভাপতিত্ব করতে না বলে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হককে সভাপতিত্ব করতে বলা হয়। ভাসানী রাগ করেন। খাওয়া বন্ধ করে দেন। শেখ মুজিব তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'মাওলানা ভাসানীর উদারতার অভাব, তবুও তাঁকে আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতাম। কারণ, তিনি জনগণের জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত। যে কোন মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, তারা জীবনে কোনো ভাল কাজ করতে পারে নাই—আমার বিশ্বাস।'

বঙ্গবন্ধু মুজিব তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন দেশের মানুষের মুক্তির জন্য। বারবার মৃত্যু তাঁর সামনে এসেছে, তিনি ভয় পান নাই, এটা তাঁর মুখের কথা নয়, অন্তরের কথা। একাত্তরে পাকিস্তানের জেলে তাঁর সেলের পাশে তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হলে তিনি যা বলেছেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরও বলেছি, তোমরা (আমাকে) মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।'

নিজের জীবনটা দান করে দিয়ে শেখ মুজিব তাঁর কথা রেখেছেন। তাঁর অনুসারীরা কে কী ত্যাগ করছেন, আর কী কী অর্জন করছেন, কয়টা প্লট নিলেন, কত বড় গাড়িতে চড়েন, সেই খবর নিতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে নাকি?

সবাই নিশ্চয়ই এক রকম নয়। এই দেশে ত্যাগী মানুষ, ত্যাগী নেতা নিশ্চয়ই আছেন। তা না হলে মুজিবের এই বাংলায় সূর্য কেন আজও ওঠে, কেন আজও বৃষ্টি হয়, ফুল ফোটে?

২৯.০৮.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিভাবকেরা আর সন্তানেরা

নতুন প্রজন্ম সব সময়ই আগের প্রজন্মের চেয়ে চৌকস হয়, মেধাবী হয়। আমরা যখন স্কুলে পড়েছি, তখন ১৯৭০ সালের জ্ঞান, ১৯৮০ সালের জ্ঞান আহরণ করেছি। এখনকার প্রজন্ম ২০১২ সালের জ্ঞান পেয়ে বড় হচ্ছে। আর দুনিয়া এত গতিময় হয়ে গেছে যে দুই বছর আগের তথ্য আর জ্ঞানই এখন পুরোনো হয়ে যাচ্ছে।

কাজেই আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের চেয়ে স্মার্ট হবেই। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন আমার ধারণা ছিল, আব্বা কিছু বোঝেন না। আর আমার মেয়ে ভাবত, তার বাবা কিছুই বোঝে না। তারপর যখন আমার বয়স বেড়েছে, তখন আমি বুঝেছি, আব্বার পক্ষেও একটা জিনিস আছে, তার নাম অভিজ্ঞতা। আমার মেয়ে এখন বলে, বাবাকে যতখানি না-বুঝ সে মনে করত, বাবা ততটা নয়। কারণ ওই একটাই, অভিজ্ঞতা।

এই বিষয়ের পুরোনো কৌতুকটা আগে বলে নিই। আমার সবচেয়ে প্রিয় কৌতুকগুলোর একটা।

একটা টুপিওয়ালা একটা গাছের নিচে টুপি সাজিয়ে বসে টুপি বিক্রি করছে। গাছে ছিল কতগুলো বাঁদর। টুপিওয়ালার মাথাতেও একটা টুপি ছিল। বাঁদরগুলো ঝাঁপিয়ে নামতে লাগল গাছের ডালপালা থেকে। টুপিওয়ালার সব টুপি ছিনতাই করে প্রতিটি বাঁদর একটা করে টুপি চাপাল নিজ নিজ মাথায়।

টুপিওয়ালা হায় হায় করতে লাগল। এখন কী হবে! তার তো আজ পুরোটাই লোকসান। সে অনেক কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, বাঁদর সাহেবগণ, আমার টুপিগুলো ফেরত দিন। তারা দিল না। টুপিওয়ালা বাঁদরগুলোর দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। বাঁদরগুলোও গাছের ফুল-ফল যা হাতের কাছে পেল, তাই ছিঁড়ে নিয়ে টুপিওয়ালার দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। শেষে টুপিওয়ালার একটা কথা মনে পড়ল। বাঁদর অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় প্রাণী। টুপিওয়ালা তখন তার মাথার টুপি খুলে ছুঁড়ে মারল মাটিতে। বাঁদরগুলোও তার অনুকরণে নিজেদের মাথার টুপি খুলে ছুঁড়ে মারল নিচের দিকে। টুপিওয়ালা সব টুপি কুড়িয়ে নিয়ে ওই স্থান ত্যাগ করে বাঁচল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুদিন পরের কথা। এবার টুপিওয়ালার নাতি এসেছে টুপি নিয়ে। ওই একই গাছের নিচে। একটা মাদুরে টুপি বিছিয়ে সেও টুপি বিক্রি করতে লাগল। অমনি গাছ থেকে একদল বাঁদর লাফিয়ে নেমে সব টুপি তুলে নিয়ে উঠে পড়ল গাছে। প্রত্যেক বাঁদরের মাথায় একটা করে টুপি।

টুপিওয়ালার নাতি কাকুতি-মিনতি করল, ঢিল ছুঁড়ল, কোনো লাভ হলো না। তখন মনে পড়ল তার দাদার গল্প। তার দাদা গল্প করেছিলেন, একবার তাঁর সব টুপি বাঁদররা নিয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন তাঁর মাথার টুপি খুলে ছুঁড়ে মেরেছিলেন মাটিতে, আর তাঁর দেখাদেখি সব বাঁদর মাথার টুপি খুলে নিচে ছুঁড়ে মেরেছিল।

নাতি-টুপিওয়ালা দাদার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইল। সে তার মাথার টুপি খুলল। আর মাটিতে ছুঁড়ে মারল।

কিন্তু কোনো বাঁদরই তাদের মাথার টুপি খুলে মাটিতে ছুঁড়ে মারল না।

নাতি-টুপিওয়ালা বলল, কী ব্যাপার, তোমরা আমাকে অনুকরণ করছ না কেন? এই রকমই না হওয়ার কথা!

তখন একটা বাঁদর বলল, খালি তোমারই দাদা আছে, আমাদের দাদা নাই? খালি তোমার দাদাই তোমাকে গল্প করেছেন, আমাদের দাদা আমাদের গল্প করেন নাই? দাদারা গল্প করেন, জ্ঞান অর্জন করেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, ঠেকে শেখেন, তাই দেখে নাতিরা শেখে। এটাই জগতের নিয়ম।

আমার আব্বা ছিলেন পিটিআই বা প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক। তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল, আমার ছেলেমেয়েদের কেউ মারতে পারবে না। তিনি মনীষীদের উদ্ধৃত করে বলতেন, শিশুকে প্রকৃতির বুকে ছেড়ে দাও, প্রকৃতিই শিশুকে শিক্ষা দেবে।

আমরা, তাঁর পাঁচ ছেলেমেয়ে নিজের নিজের ইচ্ছামতো বড় হয়েছি। আমার দুই ভাই-বোন ডাক্তার, দুই ভাই ইঞ্জিনিয়ার (এর মধ্যে একজন আমি। ব্যর্থ ইঞ্জিনিয়ার। ছোটবেলায় আমরা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতাম। ডাব না কাটলে কী হয়? সঠিক উত্তর ছিল : নারকেল হয়। বড় হয়ে আমি ধাঁধা বানিয়েছি, ইঞ্জিনিয়ার সফল হলে কী হয়? এফ আর খান বা জামিলুর রেজা চৌধুরী বা আইনুন নিশাত হয়। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ব্যর্থ হলে কী হয়? আমার মতো লেখক-সাংবাদিক হয়)। ছোট ভাই একটা আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থায় ভালো কাজ করে। আমি তাকে বিজ্ঞান পড়তে নিরুৎসাহিত করেছিলাম। ভাগ্যিস করেছিলাম। যাই হোক, আমরা যে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি বা পড়িনি, কোনোটাই আব্বা-আম্মার ইচ্ছায় হয়নি, আমরা নিজেদের ইচ্ছায় হয়েছি (বা হইনি)। আম্মা অবশ্য খুব চেয়েছেন, আমরা পরীক্ষায় ভালো করি।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একবার আমার সঙ্গে আলাপকালে একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন। আমাদের অভিভাবকেরা মনে করেন, তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেমেয়েদের মতো দুর্বল, নাজুক মানবসন্তান আর এই পৃথিবীতে আসেনি, কাজেই তাদের দাঁড় করিয়ে দেয়া এবং নিজেদের অবর্তমানে তাদের ভালো থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া পিতামাতার কর্তব্য। সব সময়ই মা-বাবারা বলেন, আমার জন্য তো করছি না, আমাদের সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে এত কিছু করতে হচ্ছে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রশ্ন করছেন, কেন আমরা ভাবছি আমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ আমাকে গড়ে দিতে হবে, তারা নিজেদেরটা নিজেরা সামলাতে পারবে না!

কোনো সন্তানই তার বাবা-মায়ের মতো হয় না। নতুন প্রজন্ম নতুনের মতোই হয়। আমার আব্বা আমার দাদার মতো হননি, আমিও আমার আব্বার মতো হইনি। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে, সেটা হলো শ্রেয়বোধ, মঙ্গলবোধ, আদর্শবোধ।

সদ্য বিজনেস অ্যাওয়ার্ড ফর পিস অর্জনকারী লতিফুর রহমান সাহেব একটা ছোট্ট কিন্তু অমূল্য কথা বলেছেন। যেকোনো বাবা-মা তাঁর সন্তানদের যে উপদেশ দেন, সেটা মেনে চললেই জীবন ও পৃথিবী সুন্দর হবে। অন্য কোনো উপদেশ দরকার নেই। সব বাবা-মাই ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেন–সত্য কথা বলবে, সৎ পথে চলবে, মানুষের উপকার করবে। এমনকি সবচেয়ে অসৎ মানুষটিও নিজের ছোট্ট বাচ্চাটিকে অসৎ হওয়ার উপদেশ দেবেন না! কাজেই শৈশবে বাবা-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে নিই। বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজগুলোয় মোট শিক্ষার্থী ধারণক্ষমতা নির্দিষ্ট। যে পদ্ধতিতেই নেয়া হোক না কেন, ভর্তি হতে ইচ্ছুক সব শিক্ষার্থী সুযোগ পাবেন না। যদি এক লাখ ছেলেমেয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চান, হয়তো দুই-তিন হাজার জন হতে পারবেন, বাকি ৯৭ হাজারই ভর্তি হতে পারবেন না। সেটা ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই হোক, আর প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই হোক। বাকি ৯৭ হাজারের জীবন কি তাই বলে বৃথা যাবে?

আবার ভর্তি পরীক্ষায় যে শিক্ষার্থী সবচেয়ে ভালো করবেন, তিনিই কি মেডিকেলের পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো করবেন? মেডিকেলের ফাইনালে যিনি সবচেয়ে ভালো করবেন, তিনিই কি সবচেয়ে ভালো ডাক্তার হবেন? জীবন এ রকমেরই এক আশ্চর্য জাদুমঞ্চ, এখানে কে কী করবে, আগে থেকে বলা যায় না। আর কারও জীবনই শেষতক বৃথা যায় না।

অভিভাবকদের উদ্দেশে বলি (আসলে নিজের উদ্দেশে, কারণ আমি নিজেও একজন অভিভাবক), অভিভাবকদের উচ্চাভিলাষ, অতিরিক্ত প্রত্যাশা ছেলেমেয়েদের জন্য বড় বোঝা, বড় চাপ হয়ে উঠতে পারে। আপনার ছেলে বা মেয়ে যা করছে, যেমন করছে, তা-ই তারিফ করতে শিখুন। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন 'প্রবলেম চাইল্ড', তাকে ডজন খানেক স্কুল বদল করিয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়াশোনা করানো যায়নি। তাতে কী হয়েছে? আসুন, কাহলিল জিবরানের কবিতাটা পড়ি: অনুবাদ করি:

সন্তানদের নিয়ে

তোমার সন্তানেরা তোমার সন্তান নয়।
জীবনের নিজের প্রতি নিজের যে তৃষ্ণা, তারা হলো তারই পুত্রকন্যা।
তারা তোমাদের মাধ্যমে আসে, তোমাদের থেকে নয়।
এবং যদিও তারা থাকে তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু তাদের মালিক তোমরা নও।
তুমি তাদের দিতে পারো তোমার ভালোবাসা,
কিন্তু দিতে পারো না তোমার চিন্তা, কারণ তাদের নিজেদের চিন্তা আছে।
তুমি তাদের শরীরকে বাসগৃহ জোগাতে পারো, কিন্তু তাদের আত্মাকে নয়।
কারণ তাদের আত্মা বাস করে ভবিষ্যতের ঘরে। যেখানে তুমি যেতে পারো না,
এমনকি তোমার স্বপ্নের মধ্যেও নয়।

তুমি তাদের মতো হওয়ার সাধনা করতে পারো, কিন্তু
তাদের তোমার মতো বানানোর চেষ্টা কোরো না।
কারণ জীবন পেছনের দিকে যায় না, গতকালের জন্যে বসেও থাকে না।
তোমরা হচ্ছ ধনুক, আর তোমাদের সন্তানেরা হচ্ছে ছুটে যাওয়া তির।
ধনুর্বিদ অনন্তের পথে চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন তার তির ছোটে
দ্রুত আর দূরে।
তুমি ধনুক, তুমি বাঁকো, ধনুর্বিদের হাতে তোমার বেঁকে যাওয়া যেন আনন্দের জন্য হয়।
তিনি কেবল চলে যাওয়া তিরটিকে ভালোবাসেন তা-ই নয়,
তিনি তো দৃঢ় ধনুকটিকেও ভালোবাসেন।

রবীন্দ্রনাথের একই বিষয় নিয়ে একটা কবিতা আছে, 'উপহার' শিরোনামে।

আমাদের সন্তানেরা নদীর মতো, তারা গান গাইতে গাইতে সব বাধা অতিক্রম করে সামনে চলতে থাকবে। পেছন দিকে তাকানোর তাদের সময় কোথায়? আমরা, বুড়োরা, পর্বতমালার মতো স্থাণু হয়ে থেকে যাব, আর নদীটির কথা মনে করব, তাকে অনুসরণ করব আমাদের ভালোবাসা দিয়ে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা পাহাড়, আমাদের সন্তানেরা নদী, আমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলতে পারব না।

০৪.০৯.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেবুন, কোকেইন ও ক্ষমতাধরেরা

ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কে কাজ করে ঠিক সেভাবে, যেভাবে কাজ করে কোকেইন। কথাটা আমার নয়। এটা প্রকাশিত হয়েছে যুক্তরাজ্যের টেলিগ্রাফ পত্রিকায়, ২৬ এপ্রিল ২০১২ সংখ্যায়। শিরোনাম হলো, 'বেবুনদের মতোই আমাদের নির্বাচিত নেতারা ক্ষমতায় আসক্ত।' বেবুন হলো একপ্রকারের বাঁদর। এই লেখায় ড. আয়ান রবার্টসন জানাচ্ছেন, কতগুলো বেবুনের ওপর নিরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে, যখন কেউ ক্ষমতা পায়, তখন তার মস্তিষ্কে এমন পরিবর্তন সংঘটিত হয় যা তার শরীরে বেশি করে টেস্টোস্টেরন নির্গত হতে উদ্বুদ্ধ করে। মস্তিষ্কে ডোপামিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটা ঠিক সেভাবে কাজ করে, যেভাবে কাজ করে কোকেইন। ক্ষমতা মানুষকে ক্ষমতার নেশায় বুঁদ করে ফেলে।

বেবুনদের ওপর বিজ্ঞানীরা নিরীক্ষা করে দেখেছেন, যেসব বেবুন পালের গোদা, বেশি ক্ষমতাশালী, তাদের মস্তিষ্কে ডোপামিনের পরিমাণ যায় বেড়ে, তারা খুবই আগ্রাসী হয়ে ওঠে, বেশি তৎপর হয়, যৌনতাপরায়ণ হয় এবং ক্ষমতার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাদের মস্তিষ্ক তেমনিভাবে কাজ করতে থাকে, যেমন করে কাজ করে একজন কোকেইনসেবীর মস্তিষ্ক। কোকেইনসেবীর মতোই তারা সাময়িকভাবে চরম আনন্দ পায়, কিন্তু আখেরে এটা তাদের নেশাসক্ত করে ফেলে এবং তার পরিণাম ভালো হয় না।

কোনো একটা পক্ষ যদি বিপুল জনপ্রিয় হয়, তা হলে নির্বাচন-পদ্ধতি যা-ই হোক না কেন, তারা জয়লাভ করবেই। আর কোনো সরকারের জনপ্রিয়তায় যদি ধস নামে, তারা যদি ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় হয়, কিংবা বলি, জন-অপ্রিয় হয়, ছল-বল-কৌশল যা-ই তারা অবলম্বন করুক না কেন, ক্ষমতা তারা ধরে রাখতে পারে না। এবং কারও ক্ষমতাই চিরস্থায়ী হয় না। যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন, তাঁরা অবশ্য কোনো দিনও বিশ্বাস করেন না যে তাঁরা অজনপ্রিয়, তাঁরা কোনো দিন ক্ষমতার বাইরে যাবেন, তাঁদের কোনো দিনও বিরোধী দলের স্থান নিতে হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতাসীনেরা ক্ষমতা ছাড়তে চান না, এটা পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে। তবু, জীবনানন্দ দাশ বিষণ্ণ চোখ মেলে দেখেছেন, এশিরিয়া ধুলো আজ, ব্যাবিলন ছাই হয়ে ভাসে। কার ক্ষমতাই বা এই দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হলো?

আচ্ছা, ধরুন, আপনি একটা রাজনৈতিক দলের প্রধান নীতিনির্ধারক। আপনার সামনে ক্ষমতা ধরে রাখার দুটো বিকল্প খোলা। এক. ভালো ভালো কাজ করে জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে চলা, অন্তত জনপ্রিয়তায় যাতে ধস না নামে, সেই চেষ্টা করা। তারপর একটা সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে নিজেকে জনতার আদালতে হাজির করা। দুই. নির্বাচন-পদ্ধতিটাকেই এমন করে তোলা যাতে 'আমি' ছাড়া আর কেউ জিততে পারবে না। কিন্তু এটা করতে গেলে একটা সমস্যা হবে, আপনার জনপ্রিয়তায় ধস নামবে। আপনি কোন্‌টা করবেন?

টেলিগ্রাফ পত্রিকার কথা সত্য বলে ধরে নিলে, আপনি তো আবার বেবুনের মতোই ক্ষমতাসক্ত। আপনার অবস্থা এখন হেরোইনখোরের মতো, আপনি আর সুস্থভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাই রাখেন না। কাজেই আপনি যা ভাববেন, তা হলো, ভালো ভালো কাজ করে নির্বাচনে গেলেই যে আমি জয়লাভ করব, তার নিশ্চয়তা কই। তার চেয়ে যেভাবেই হোক, নির্বাচনে আমি যাতে জিতিই, সেটা নিশ্চিত করো। তাতে আমি জনপ্রিয় থাকলাম কি থাকলাম না, কী বা এসে যায়। জনপ্রিয়তা দিয়ে আমি কী করব যদি নির্বাচনেই না জিতি, যদি ক্ষমতাই হাতছাড়া হয়। আর অজনপ্রিয় হলেই বা কী ক্ষতি, যদি নির্বাচন মানেই আমার জয়লাভ, এটা নিশ্চিত থাকে।

হ্যাঁ, এই রকম আপনি ভাবতে পারেন বটে। তবে একটা কথা আপনাকে বলে রাখা দরকার, অজনপ্রিয় সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারে না। জনগণ আপনাকে চায় না, আর আপনি নির্বাচনী-প্রকৌশল প্রয়োগ করে ক্ষমতায় টিকে থাকবেন, এটা কখনোই হবে না। হলে, আজকে তারেক রহমানের বিএনপিই ক্ষমতায় থাকত।

এই কলামে আমি অন্তত দুবার একটা মন্তব্য করেছিলাম, আওয়ামী লীগ আসলে সরকার খারাপ চালায় না, আওয়ামী লীগের সমস্যা তার খাসলতে, মানে তার স্বভাবে, তার চালচলনে। এ সপ্তাহে এক পাঠক আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আপনি কি এখনো মনে করেন, আওয়ামী লীগ আসলে সরকার খারাপ চালায় না?

মহাজোট সরকার ক্ষমতা নেয়ার অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় ২০১০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আমার একটা লেখা ছাপা হয়েছিল। তাতে লিখেছিলাম, 'শেখ হাসিনার নতুন মন্ত্রিসভা নিয়ে সাধারণভাবে অনেকেই খুশি। এই মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজ বা সন্ত্রাসী লালনের অভিযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। চাঁদাবাজিতে দক্ষ অনেকে পাত্তাই পাননি। তরুণ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির এই মন্ত্রিসভায় নারীদের প্রাধান্য নিয়েও আমরা গর্ব করতে পারি। এই মন্ত্রিসভা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, দুর্নীতি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলীয়করণ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে দেশের স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরে, তা হলে বলা যাবে, বাংলাদেশে একটা পুরোনো যুগের অবসান ঘটল, হলো এক নতুন যুগের সূচনা। প্রাথমিকভাবে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাতেই হয় এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। একচেটিয়া জয়লাভের আগে-পরে শেখ হাসিনার কথাবার্তাও খুবই সংযত ও রাষ্ট্রনায়কসুলভ বলেই মনে হয়েছে।

'প্রাথমিক মুগ্ধতা কেটে গেলে আসে বাস্তবতাবোধ। আমরা যখন একজন গাড়ির চালক নিই, তখন প্রথমেই যেটা দেখতে হয়, সে গাড়ি চালাতে জানে কি না। সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যও খুব দরকার, কিন্তু প্রথম গুণটা না থাকলে বাকি গুণ দিয়ে হয় না। দেশের চালকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সততা, ঐকান্তিকতা, সৌজন্য—এসব খুবই দরকার কিন্তু এক নম্বর গুণটা আছে তো! যিনি যে পদ লাভ করলেন, সে ব্যাপারে তিনি যোগ্য তো!'

এখন মনে হচ্ছে, আমার গাড়ির চালক কেবল গাড়ি চালাতে জানে না, ব্যাপার শুধু তা-ই নয়, সে নিয়মিত তেল চুরি করে, গাড়ি বাইরে নিয়ে গিয়ে ভাড়া খাটায়, গাড়ির যন্ত্রাংশ খুলে বিক্রি করে দেয়, সে নিয়মিত কাজে আসে না, প্রায়ই ফাঁকি দেয় এবং আশপাশের লোকজন তার আচার-আচরণে অতিষ্ঠ!

তার পরও সেই চালককে আমি কাজে রাখি কী করে?

শেয়ার মার্কেটে ধস, বিভিন্ন হায় হায় কোম্পানি কর্তৃক মানুষের পকেট কেটে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট, পদ্মা সেতু বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ এবং অবশেষে সরকারি ব্যাংক থেকে তিন-চার হাজার কোটি টাকা হাপিস হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে আছে গুম, খুন-রুনি হত্যাকাণ্ডের কিনারা না হওয়া। ছাত্রলীগ-যুবলীগের কর্মীদের বাড়াবাড়ি। বহু ব্যর্থতার মূল কারণ কিন্তু অন্ধ দলীয়করণ। ১৯৯৬-২০০১ সালে সরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জনকারী অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংক বিশেষজ্ঞরা। ২০০৯ সালের পরে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে এসেছেন আওয়ামী লীগ- ছাত্রলীগ-যুবলীগের মাঠপর্যায়ের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকেরা! বুয়েটে আজকে অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে সহ-উপাচার্যের পদ থেকে সরানো হলো, কিন্তু এ সমস্যা দানাই বাঁধত না, যদি না দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে তাঁকে জ্যেষ্ঠতা ছাড়াই এই পদে নিয়োগ দেয়া হতো!

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অযোগ্যতা, অদক্ষতা, কখনো কখনো দুর্নীতির যে বিপুল অভিযোগ, তা সত্ত্বেও কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা কেন নেয়া হয় না? এত বড় হলমার্ক কেলেঙ্কারির পরও একটা লোকও গ্রেপ্তার হলো না! এত অভিযোগের পরও কোনো মন্ত্রী-এমপির বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে, এই রকম খবর কি কেউ শুনেছেন?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারদা পুলিশ একাডেমিতে বলেছেন জিরো টলারেন্সের কথা। জিরো টলারেন্স নীতি যদি শুরু করতে হয়, সেটা করতে হবে ওপর থেকে, ঘর থেকে, মন্ত্রিসভা থেকে, দল থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা, নিজের ভালো মানুষ নিজে বুঝবে না? কেউ কি ইচ্ছা করে নিজের জনপ্রিয়তা কমানোর আয়োজন করে?

একটা সরকার যখন তার মেয়াদে ব্যর্থ হয়, তখন সেই সরকার একা ব্যর্থ হয় না, পুরো দেশের সম্ভাবনাই বিনষ্ট হয়, ১৫ কোটি মানুষই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একটা সরকার যখন সফল হয়, তখন একা একা সফল হয় না, পুরো দেশটাও এগিয়ে যেতে থাকে। কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য যেমন সরকারের, তেমনি কৃষকদের, তেমনি পুরো দেশের। একইভাবে পদ্মা সেতু না হলে সেটা কেবল মহাজোট সরকারের ব্যর্থতা নয়, তার অর্থ দাঁড়াবে পুরো দেশের একটা বিশাল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকেই নস্যাৎ করে দেয়া।

সরকারের হাতে এখনো সোয়া বছর সময় আছে। এই সময়টাতে সরকার কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না? দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে, অদক্ষদের অপসারিত করে, সর্বত্র যোগ্য ও দক্ষ মানুষকে কাজের সুযোগ করে দিয়ে একটা ইতিবাচক কর্মযজ্ঞ শুরু করার সময় কি শেষ হয়ে গেছে?

আমি চাই না আগামী সোয়া বছরে ব্যর্থতার মিছিল আরও ব্যর্থতা ডেকে আনুক।

কিন্তু আমার চাওয়া দিয়ে কিছুই যায়-আসে না। যাদের চাওয়া-পাওয়া আসলে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁরা তো যে যাঁর উচ্চ আপন বাঁশের মাচায় আত্মতুষ্ট অবস্থায় ঝিমোচ্ছেন।

আর মোসাহেবেরা কী বলছে?

চমৎকার চমৎকার।

চমৎকার সে হতেই হবে, হুজুরের মতে অমত কার?

কাজেই আমাদের সামনে কোনো আশা নেই। আগামী সোয়া বছরে সরকারের আচার-আচরণ কোনো এক আশ্চর্য জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় বদলে গিয়ে অপরূপ হয়ে উঠবে না। আর জনপ্রিয়তা যদি না থাকে, তা হলে কেউ ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে, ইতিহাস তা বলে না। কোনো অলৌকিক কারণে আমাদের বিবদমান রাজনৈতিক পক্ষগুলো সমঝোতায় উপনীত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করবে, এই রকম একটা আকাশকুসুম আমরা রচনা করতে পারি। কিন্তু তা না হলে কী হবে, আমাদের নিকট ভবিষ্যৎ কেমন হতে যাচ্ছে, কল্পনাও করতে পারছি না। দুর্ভাবনায় তাই ছেয়ে আসে আকাশ। কিন্তু যাঁদের এসব নিয়ে ভাবিত হওয়ার কথা, তাঁরা কী করছেন। টেলিগ্রাফ-এর শিরোনামটা অবিকল তুলে দিই: লাইক বেবুনস, আওয়ার ইলেকটেড লিডারস আর লিটারেলি অ্যাডিকটেড টু পাওয়ার। নেশায় যাঁরা বুঁদ হয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে আপনি কী আশা করতে পারেন?

১৮.০৯.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার কোন্ মুখ বিশ্বকে দেখাব

এখন যদি আপনি গুগল করেন 'বাংলাদেশ' শব্দটা লিখে, অন্য কয়েকটা জিনিসের সঙ্গে যা পাবেন, তা হলো নিউইয়র্কে বাংলাদেশি তরুণ আটকের খবর। ২১ বছরের ওই তরুণ নাকি নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নিয়েছিল। এই খবরটা প্রচারিত হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে? এক. উদ্বেগ। উৎকণ্ঠা। শঙ্কা। সর্বনাশ! এ কী খবরের সঙ্গে বাংলাদেশের নাম জড়িয়ে গেল! প্রবাসী বাংলাদেশিরা না আবার নানা ধরনের চাপ, হয়রানি, অতিরিক্ত নিরাপত্তা তল্লাশি, সন্দেহের ঘেরে পড়ে যান। আমাদের ছেলেমেয়েদের না বিদেশে পড়তে যেতে অসুবিধা হয়। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য না ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই রকম ঘৃণ্য অমার্জনীয় কাজের সঙ্গে বাংলাদেশের তরুণ যুক্ত হতে গেল কেন? দুই. সন্দেহ। বাংলাদেশের একজন তরুণ এই কাজ করতে পারে? এটা কি সম্ভব? তিন. ষড়যন্ত্রতত্ত্ব। বাংলাদেশের কোনো তরুণের পক্ষে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়, কাজেই এটা একটা ষড়যন্ত্র।

অর্থাৎ বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই এ ধরনের খবরের সঙ্গে বাংলাদেশের নাম উচ্চারিত হোক, তা চায় না। যখন উচ্চারিত হয়, তখন বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ সেটা মেনে নিতে পারে না, বিশ্বাস করতে চায় না। এর কারণ কী? কারণ, বাংলাদেশের মানুষ শান্তির ওপর খুবই শান্তিপ্রিয়। বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধবাজ নয়, তারা তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই কখনোই পররাজ্যে হামলা করেনি। এখানে সব ধর্মই শান্তির কথা বলে, সম্প্রীতির কথা বলে। আর এ দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সুফি-সাধকদের মাধ্যমে, যাঁরা বলে গেছেন প্রেমের কথা, যাঁদের সাধনা মরমি সাধনা। এখনো এই দেশের অনেক মাজারে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে হাজির হয়, শিরনি দেয়। কাজেই কোথাও বোমা ফুটলে, কোথাও মানুষের প্রাণহানি ঘটতে দেখলে বাংলাদেশের মানুষের মন কেঁদে ওঠে। কাজেই বাংলাদেশের একজন নাগরিক কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে যুক্ত থাকতে পারে, এটা বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হয়।

এফবিআই ফাঁদ পেতে যে কৌশলে ওই তরুকে হাতেনাতে ধরেছে, খোদ আমেরিকাতেই সে কৌশলের সমালোচনা করা হয়েছে, হচ্ছে, আমরা এখন বিভিন্ন কাগজের মাধ্যমে তা জানতে পারছি। ব্যাপারটা এখনো বিচারাধীন। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকার গ্র্যান্ড জুরি বলবে আদৌ এই মামলা চলবে কি-না। কাজেই বিচারাধীন কোনো বিষয় নিয়ে এবং ব্যাপারটা সম্পর্কে খুব বেশি না জেনে আমাদের পক্ষে কোনো মন্তব্য করা সংগত হবে না। তবে একটা আফসোস নিশ্চয়ই আমাদের হচ্ছে, ওই তরুণটির মনে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে, এটা জানার পর তাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনায় কৃত্রিম সহযোগিতা না করে কি কাউন্সেলিং করা যেত না? একটা উর্বর বীজতলায় আপনি সন্ত্রাসবাদের বীজ ফেলবেন নাকি উদার মানবিকতা, অহিংসা, সম্প্রীতির বীজ ফেলবেন?

আমরা সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের ঘোরতর বিরোধী। আমরা বারবার প্রচার করব প্রাচ্যের অহিংসাবাদের বাণী। বলব, ভালোবাসো, ঘৃণা কোরো না; বুকে টেনে নাও, আঘাত কোরো না। হিংসা কেবল হিংসা ডেকে আনে। ভালোবাসাই জন্ম দেয় ভালোবাসার।

ও ভাই ভয়কে মোরা জয় করিব হেসে,
গোলাগুলির গোলেতে নয় গভীর ভালোবেসে।
ভালোবাসায় ভুবন করে জয়,
সখ্যে তাহার অশ্রুজলে শত্রুমিত্র হয়
সে যে সৃজন পরিচয়।

বলছি, একটা উর্বর তৈরি বীজতলায় আপনি কিসের বীজ বপন করবেন, সম্প্রীতির নাকি বিদ্বেষের। আর পৃথিবীর কাছে আপনি আপনার দেশের কোন্ ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চান, একটা শান্তিবাদী দেশের, নাকি যে দেশের কোনো না কোনো নাগরিক সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত, সেই দেশের?

আমি মনে করি, আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বেশ একটা সমস্যা আছে। আমাদের দেশে আমরা খুব নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে থাকি। একটা অদ্ভুত বৈপরীত্য আছে আমাদের মধ্যে। একদিকে বাঙালিদের সমালোচনায় বাঙালিদের মতো মুখর আর কেউ আছে কি-না সন্দেহ। বাঙালি হুজুগে, বাঙালি দুর্বল, বাঙালি দুর্মুখ–এটা আমরা নিজেরা প্রচার করি সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে আমরাই শ্রেষ্ঠ, এই ধরনের একটা মনোভাবও আমাদের আছে। আর আমরা বহুত্বে একদম বিশ্বাস করি না। আপনি বিশ্বের যেকোনো দেশের রাজধানীতে যান, দেখবেন, নানা রঙের, নানা আকারের মানুষ। কেউ সাদা, কেউ কালো, কারও নাক বোঁচা, কারও নাক খাড়া। আমাদের ঢাকা শহরে আমরা শুধু একই ধরনের চেহারা দেখে থাকি। লেখক শাহরিয়ার কবির আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন। বিদেশে কোনো একটা অনুষ্ঠানে 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটা গাওয়া হচ্ছিল। তাতে ওই যে পঙ্‌ক্তি আছে : এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি–সেটার অনুবাদ শুনে শ্রোতারা আপত্তি করেছিল। বলছিল, তোমরা এ কী গান গাইছ? নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করা তো নাৎসিবাদ!

আমাদের স্কুল-কলেজে আমরা তো এ ধরনের শিক্ষাই দিই। আমরাই শ্রেষ্ঠ। আমাদের ভাষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের সাহিত্য শ্রেষ্ঠ। আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতবাদ শ্রেষ্ঠ। আমাদের জাতি শ্রেষ্ঠ। আমার ধারণা, এই উচ্চমন্যতা এসেছে হীনম্মন্যতা থেকে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার খেতে খেতে, পরাজিত হতে হতে এখন আমরা আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে উচ্চমন্যতাকে বর্ম হিসেবে ধারণ করে নিয়েছি।

অন্যদের মতও যে মত, অন্যদের বিশ্বাসও যে বিশ্বাস, সব মত, সব পথই যে শ্রদ্ধেয়, সবাই মিলেই যে এই পৃথিবীতে বিরাজ করতে হবে, এই কথাটা আমরা কিন্তু খুব কম সময়েই উচ্চারণ করি।

তার ফল মাঝেমধ্যে হয়ে পড়ে খুব মারাত্মক। আমরা কোনো এক ছুঁতোয় হামলে পড়ি রামু-উখিয়ার বৌদ্ধমন্দিরে ও বসতিতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ক্রিকেটে হেরে আমরা তাদের বাসে ঢিল ছুঁড়ি।

আর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর গলদ আছে। আমরা কেবল নোট পড়িয়ে, এমসিকিউয়ের উত্তর শিখিয়ে ভালো ফল আদায় করার চেষ্টায় রত। ছাত্রছাত্রীরা আর কবিতা পড়ে না, গল্প পড়ে না, তারা কেবল প্রশ্নের উত্তর শেখে। আগে সবাই হরে-দরে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইত, এখন পড়ে এমবিএ-বিবিএ। সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, কলা না পড়লে একটা ছেলের মনটা উদার হবে কী করে? স্মরণ করিয়ে দিতে চাই শিকাগোর সিয়ারস টাওয়ারের নিচে আবক্ষ মূর্তির সঙ্গে খোদিত প্রকৌশলী ফ্রাঙ্ক আর খানের উক্তি, 'একজন প্রযুক্তিবিদের অবশ্যই তার আপন প্রযুক্তিতে হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাকে অবশ্যই জীবনকে উপভোগ করতে জানতে হবে। আর জীবন হলো শিল্প, নাটক, সংগীত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—মানুষ।'

নিউইয়র্কে এফবিআইয়ের ফাঁদে ধরা পড়া ছেলেটি যদি সত্যি সত্যি এ রকম একটা ভয়ংকর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে কি আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে না, কোন্ শিক্ষা, কোন্ সংসর্গ, কোন্ পরিস্থিতি তাকে অপরাধী করে তুলল?

আমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছি, নিষিদ্ধঘোষিত একটা রাজনৈতিক সংগঠন দেশের নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চৌকস ছেলেমেয়েদের টার্গেট করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আর কোনো কোনো স্কুলে জাতীয় সংগীত গাওয়া নিষেধ, সেসবের খবরও তো আমরা মাঝেমধ্যে পাই।

আমি অতি-সরলীকৃত করে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল থেকে পড়ে বেরিয়েছেন, শিল্পে-সংস্কৃতিতে-সমাজসেবায় প্রগতির চর্চায় ভালো করছেন, এই রকম বহুজনের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। কিন্তু ওই স্কুলে বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট দিতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, সেটা আরেকবার বলি। আমি আগের বারের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই ছিলাম। পরের বারেরটা তবু দিতে গেছি। প্রিলিমিনারি টেস্টে পেনসিল দিয়ে গোল্লা ভর্তি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এটা কম্পিউটারের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। তো ওই উত্তরপত্রে নাম সই করতে হয়। আমি সই করেছি বাংলায়। কারণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার স্বার সব সময় বাংলাতেই আমি দিয়ে থাকি। ওই রুমের পরিদর্শক এসে আমার উত্তরপত্রে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে বললেন, আপনি বাংলায় সাইন করেছেন কেন? এটা তো কম্পিউটারে দেখা হবে, কম্পিউটার তো বাংলা পড়তে পারে না। আমি তাঁকে বললাম, কম্পিউটার বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনোটাই পড়তে পারে না। আর আমার স্বাক্ষর একটাই আর তা বাংলা। আমার খাতা যদি বাতিল হয়, তো আমার হবে। কারণ, এর আগের বারও আমি পাস করেছি, এই বাংলা সাইন দিয়েই। আমি নিজে একজন প্রকৌশলী। আর এই উত্তরপত্র বুয়েটেই যাবে। আপনি আমার এই বাংলা সাইনটাই রাখতে দিন। কারণ, আমার ইংরেজি সাইন নেই।

তিনি কিছুতেই আমার খাতায় সই করবেন না। আমিও রেগে গেলাম। হইচই বেধে গেল। তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, পরীক্ষা হলে একজন সন্ত্রাসী ঢুকে পড়েছে। পুলিশ চলে এল।

সে অনেক দিন আগের কথা। এই গল্প আমি রস+আলোয় লিখেওছি। যতবার মনে পড়ে, ততবার হাসি। কিন্তু একটা পরাজিতের বেদনাও আমার হয়। কারণ, উনি আমাকে ইংরেজিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিলেন।

আমার খুব উদ্বেগ হয়, এই শিক্ষকেরা শিশুদের কী শেখান? আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, অন্য শিক্ষকেরা যেন এই রকম না হন। বা অন্য বিষয়ে যেন এই শিক্ষকও এই ধরনের একগুঁয়েমি প্রদর্শন না করেন।

আমাদের শিক্ষার্থীদের আমরা যেন উদার মানবিকতাবোধের সন্ধান দিই। সন্ত্রাসের নয়, সম্প্রীতির শিক্ষা দিই। সাম্প্রদায়িক বিভেদ নয়, বহু মত, বহু পথের সঙ্গে সম্প্রীতিময় সহাবস্থানের আদর্শে দীক্ষিত করি।

আমাদের জাতীয় সংগীতটি কিন্তু অপূর্ব। জাতীয় সংগীতে আমরা ভালোবাসার কথা বলি, সৌন্দর্যের কথা বলি, শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করি না। আমরা বাইরের জগতের কাছেও আমাদের ভালোবাসার বার্তা নিয়েই হাজির হতে চাই। বাংলার মানুষের শান্তিপ্রিয়তার বার্তাই আমরা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

কিন্তু আমাদের দেশের সঠিক ভাবমূর্তি তুলে ধরার ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে বা জাতীয়ভাবে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় বলে আমার জানা নেই। বরং আমাদের কর্তাব্যক্তিরা এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে থাকেন, যাতে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাহেবকে আমরা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কাজে ব্যবহার করতে পারতাম। তা না করে তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করে আমরা কার মুখ উজ্জ্বল করলাম? আমাদের বিরোধী দলের নেতারা সুযোগ পেলেই বিদেশিদের কাছে আমাদের সরকারের নিন্দা করেন। সেটা করতে গিয়ে তাঁরা যে দেশেরই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেন, সেটা কি তাঁরা জানেন? পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশের উজ্জ্বল দিকগুলোই যেন আমরা তুলে ধরি। আর নিজেদের দুর্বলতাগুলোর সমালোচনার মাধ্যমে সেসব যেন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

২৫.১০.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার ঘুম আসে না'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় তাঁকে নিয়ে এই প্রথম আলোতেই একটা কলাম লিখেছিলাম। লেখাটা ছিল একটা খোলা চিঠির মতো। তখন খুব পুশআউট-পুশইন হচ্ছিল। মানে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নো-ম্যানস-ল্যান্ড হয়ে উঠেছিল অমানবিক জমিন, কিংবা না-মানুষি জমিন। কোত্থেকে কোত্থেকে বাংলাভাষী মানুষদের ধরে এনে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ঠেলে দিচ্ছিল বাংলাদেশের দিকে। বাংলাদেশ রাইফেলসও তাদের ঢুকতে দেবে না এই দেশের ভূখণ্ডে। ওই আদমসন্তানেরা পড়ে ছিল খোলা আকাশের নিচে, সীমান্তের নো-ম্যানস-ল্যান্ডে। খুব শীত ছিল তখন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কবিতা থেকে তখন উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম :

'গাড়ি বারান্দার নিচে আমরণ অনশনে বসে আছে
তিনজন শ্রমিক
আজ তের দিন ধরে ওদের দেখছি
শীর্ণ মুখে জ্বলজ্বলে চোখ, রুক্ষ দাড়ি, জট-পাকানো চুল
আধো-হেলান দিয়ে বসা, ওদের ঘুম নেই, খালি পেট
তেতো জিভে ঘুম আসে না
ওদের দেখার জন্য ভিড় জমেনি, ওদের জন্য মেডিক্যাল বুলেটিন বেরুবে না–
'আমি রাজনীতি-ফিতি বুঝি না! আমি সইতে পারছি না ঐ
তিনজন মানুষের নিঃশব্দ বসে থাকা
তোলপাড় করছে আমার বুক...
'বাড়িতে ফিরে ভাতের থালার সামনে আমার গা
গুলিয়ে ওঠে–সারা রাত আমার ঘুম আসে না।'

সুনীলের এই কবিতা এবং আরও অনেক কবিতা, আমার কৈশোরে আমার মন তৈরিতে সাহায্য করেছিল। ভারত-বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্র যখন কয়েকজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবসন্তানকে নিয়ে অমানবিকতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিল, পুশইন-পুশআউটের নামে মানুষের ন্যূনতম মানবিক সম্মানটুকু দিতেও অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল, তখন আমার খুব খারাপ লাগছিল, ভাতের থালার সামনে আমার গা গুলিয়ে উঠছিল। ওই সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতার শেরিফ, আমি তাঁর উদ্দেশে লিখেছিলাম, প্রিয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আপনার খারাপ লাগে না?

আজকে নিজের কথা নিজেকেই ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। কতগুলো মানুষ, অবিকল আমারই মতো দেখতে, তাদেরও হাত আছে পা আছে আমারই মতো, তাদের ভাষা আছে, তাদের ঘরবাড়ি ছিল সাধ্যমতো, তাদেরও বাবা, মা, সন্তান আছে, ভাইবোন আছে, বাগান ছিল, জমিজিরেত ছিল, চারদিকে আগুন দেখে, ধ্বংস দেখে, মৃত্যু দেখে বেঁচে থাকার আকুলতায়, নিরাপত্তার আশায় তারা নাফ নদী পেরিয়ে, সমুদ্রে ডিঙি ভাসিয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে চায়। তাদের মধ্যে শিশু আছে। তাঁদের মধ্যে গর্ভবতী নারী ছিলেন, বাংলাদেশের হাসপাতালে যার সন্তান জন্ম নিয়েছিল, আমরা, বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্র, তাদের গ্রহণ করছি না। ফিরিয়ে দিচ্ছি সেই অনিশ্চয়তায়, যেখান থেকে দুঃস্বপ্ন-তাড়িত হয়ে তারা ফিরে এসেছিল। এইবার আমি আমার নিজের বিবেককেই শুধাই, আনিসুল হক মিয়া, আপনার খারাপ লাগে না?

সত্যি সত্যি আমার খারাপ লাগছে। ভীষণ খারাপ লাগছে। এটা হওয়া উচিত নয়। আমাদের এতটা অমানবিক কি হওয়া উচিত? আমরাও তো ৪১ বছর আগে দলে দলে, প্রায় এক কোটি মানুষ এমনি রকম মৃত্যু, আগুন, নিপীড়ন দেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে আশ্রয় চেয়েছিলাম পাশের দেশে, তারা যদি সেদিন তাদের সীমান্ত সিল করে দিত, কী হতো আমাদের?

সুনীল তো বলেই খালাস, আমি রাজনীতি-ফিতি বুঝি না! কিন্তু আমি নিয়মিত কলাম লেখক, আমি যদি বলি, আমি রাজনীতি বুঝি না, তা হলে আপনারা বলবেন, যা বোঝো না, তা লিখতে যাও কেন? তুমি জানো না, রোহিঙ্গারা কত বড় সমস্যা এ দেশে? প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা নব্বইয়ের দশকে এসেছিল এই দেশে, তাদের সদ্‌গতি করা যায়নি। তারা বাংলাদেশের জন্য সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে। তারা জঙ্গি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের দিয়ে নানা অপরাধ, মাদক ও অস্ত্রের চোরাচালান করানো হচ্ছে। ওদের আমরা এই দেশে স্থান দিতেই পারি না। তার ওপর আমাদের দেশের ওই এলাকাটায় নিরাপত্তাবিষয়ক স্পর্শকাতরতা আছে। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক জঙ্গি চক্রের যোগ আছে বা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে। আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তৎপরতা শুরু করুক, সেটাই বা আমরা হতে দেবে কেন? কাজেই আমাদের জন্য সবচেয়ে সহজ হচ্ছে, ওই রোহিঙ্গাদের ঢুকতে দিয়ো না। আর তুমি কি জানো না, এই যে রামুতে উখিয়ায় বৌদ্ধমন্দির ও বসতিতে হামলা হলো, এর পেছনেও তো রয়েছে রোহিঙ্গা সংযোগ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম কথা, আমি সাধারণীকরণের খুব বিপক্ষে। অমুকেরা খারাপ, এই ধরনের ঢালাও মন্তব্য খুবই বিপজ্জনক। রোহিঙ্গারা খারাপ, তারা অপরাধী, তারা জঙ্গি, রোহিঙ্গা মানেই সমস্যা, আমি এইভাবে ঢালাও কথার বিপক্ষে। কোনো একটা জায়গার মানুষ এই রকম, কোনো একটা রঙের মানুষ ওই রকম, কোনো একটা দেশের সবাই কিপটে, এইভাবে বলতে নেই, এটা সত্য নয়। সত্য হলো, সব জায়গায়, সব জাতিতে, সব দেশে, সব ভাষায় ভালো মানুষ আছে, খারাপ মানুষ আছে। কোনো ভালো মানুষও কোনো এক সময় খারাপ কাজ করতে পারে, আবার সাত খুনের আসামিও তাঁর শিশুর কান্না সহ্য করতে পারেন না, শিশুর মুখে একটুখানি হাসি দেখলে আবেগে চোখের জল মোছেন। রোহিঙ্গারা তাদের নিজেদের জন্মস্থান ফেলে শখ করে এই দেশে আসেনি। তারা বাধ্য হয়ে এসেছে। আসতে তাদের কষ্ট হয়েছে, নাড়িছেঁড়া কষ্ট। শিকড় ওপড়ানোর কষ্ট। এখনো যারা আসছে, তারা বনপোড়া হরিণীর মতো ছুটে আসছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, বুঝলাম, আমাদের সাধ্য নেই রোহিঙ্গাদের স্বাগত জানানোর, তাদের ঠাঁই দেয়ার, তাদের জন্য শিবির গড়ার। তা হলে সুউচ্চ স্বরে যথেষ্ট মাত্রায় প্রতিবাদ করছি না কেন?

আমরা যুদ্ধ চাই না। শান্তি চাই। কোনো অজুহাতেই কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠুক, এটা আমরা ভাবতেই চাই না। আবার সৈন্যসংখ্যা ও সমরশক্তির দিক থেকে মিয়ানমার বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে, ক্রমাগত গণতন্ত্রহীনতা, জবাবদিহিহীনতা ও সামরিক শাসন ওখানকার মানবিক উন্নয়নের চেয়ে সামরিক উন্নয়নেই বেশি বিনিয়োগ ঘটিয়েছে। ডেইলি স্টার-এ (নভেম্বর ৫, ২০১২) মো. চৌধুরী যেমনটা বলেছেন, মিয়ানমারের (এবং বাংলাদেশ) ভূ ও সমুদ্র এলাকায় বিশ্বশক্তির খেলোয়াড়দের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব রোহিঙ্গা ট্র্যাজেডির সমাধানে কোনো স্বাধীন শক্ত পদক্ষেপকে প্রতিহত করে চলেছে।

আপাতত বল আমাদের কোর্টে নেই। এটা বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর হাতে। চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের দোস্তি পুরোনো, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, হাজার হাজার ঘরবাড়ি পোড়ানো হলো, লক্ষ মানুষ আশ্রয় না পেয়ে পশুর পালের মতো ঘুরছে, কত মানুষ মারা গেল, এখন কোথায় মানবাধিকারের প্রবক্তারা! তারা কেন মিয়ানমারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করছে না এই অমানবিক জাতিগত সহিংসতা বন্ধ করার জন্য। কেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অপরাধীদের বিচার হবে না?

রোহিঙ্গারা বৌদ্ধ না মুসলিম–এটা আমার কাছে প্রধান বিবেচ্য নয়। রোহিঙ্গারা বাংলাভাষী কি-না, এটাও আমাকে কমই ইমপ্যাথি দেয়। আমার প্রধান বিবেচ্য হলো, ওরা মানুষ। একজন মানুষও যদি ব্যথা পায়, আমি ব্যথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাই। আর আমাদের প্রতিবেশী দেশের মানুষেরা বাড়িঘর হারিয়ে, স্বজন হারিয়ে একটুখানি আশ্রয়ের সন্ধানে, নিরাপত্তার খোঁজে আমার দরজায় এসে মাথা কুটে মরছে। আমি দরজা খুলে তাদের ভেতরে নিতে পারছি না, এতে যে আমার কী খারাপ লাগছে!

বাংলাদেশ সরকারের উচিত, মিয়ানমারের ভেতরের এই মানবতাবিরোধী তৎপরতাকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মুখ গুঁজে না থেকে কথা বলা, আওয়াজ তোলা, অন্তত বিশ্বপরিমণ্ডলে আওয়াজ তোলার জন্য বিভিন্ন কৌশল নেয়া। একাত্তর সালে ইন্দিরা গান্ধী বেরিয়েছিলেন বিশ্বসফরে, বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা কেবল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সমস্যা নয়, এটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা, এই ছিল তাঁর সফরের প্রতিপাদ্য। বাংলাদেশকেও এই প্রচারণায় নামতে হবে। আর আমাদের সিভিল সোসাইটিরও উচিত, এই বিষয়ে বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠন ও মানবাধিকারবাদী রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তৎপর হওয়া।

আমার খুব মনে হয়, আহা, ওই বাচ্চাটা যদি আমি হতাম, যে তার রোহিঙ্গা বাবা-মায়ের সঙ্গে নৌকায় উঠে সাগর-নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে এসেছে। আর ঢুকতে না পেরে ফের ফিরে যাচ্ছে। একাত্তর সালে আমি খুব ছোট ছিলাম। পাকিস্তানি মিলিটারি আসবে শুনে আমরা রাতের অন্ধকারে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে আরেক গ্রামে গিয়েছিলাম। সেই সময়কার ভয় আমার বুক চেপে ধরে। আর ওই বাচ্চারা নিজেদের ঘরবাড়ি পুড়ে যেতে দেখেছে। ওদের কেমন লাগছে?

নীরবতা ভাঙার সময় কি পেরিয়ে যাচ্ছে না?

১৩-১১-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুটিকে কাঁদতে দাও

যুক্তরাজ্যের টেলিগ্রাফ পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে একাধিক প্রতিবেদন দেখলাম বাংলাদেশ নিয়ে। পড়ে খুবই উৎসাহিত বোধ করছি। একটা প্রতিবেদনের সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংসদ ভবনের ছবি। আমাদের সংসদ ভবনটা কত সুন্দর, কতটা চিত্তগ্রাহী এর স্থাপত্য, তা দিয়ে শুরু হয়েছে লেখাটা। সেখান থেকে প্রতিবেদক চলে গেলেন বাংলা একাডেমীর ইতিহাসে। আমাদের ভাষা আন্দোলন, মাতৃভাষার মর্যাদার দাবিতে রাজপথে রক্তদান আর সেখান থেকে অর্জন করে নেয়া বাংলা একাডেমী। সেই বাংলা একাডেমী চত্বরেই বসেছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব হে ফেস্টিভ্যালের আসর। লিখেছেন সামীর রহিম। টেলিগ্রাফ পত্রিকার সহকারী পুস্তক সম্পাদক। হে ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষেই এসেছেন। তাঁর প্রতিবেদনটি পড়তে পারেন এই লিংকে : (http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/9682541/Hay-Dhaka-2012-Building-a-future-for-Bangladesh.html)

সামীর রহিম আরেকটা প্রতিবেদন শুরু করেছেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের বর্ণনা দিয়ে। হত্যার রাজনীতি ও এই বিষয়ের সাহিত্য নিয়ে হে সাহিত্য উৎসবে আলোচনা হয়েছে। আর সেই আলোচনার খবর জানাতে গিয়ে সামীর প্রথমে সফর করে নিয়েছেন বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, যেখানে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নিহত হতে হয়েছিল।

সন্দীপ রায় এসেছেন কলকাতা থেকে। তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে ফার্স্টপোস্ট ডট কমে। (http://www.firstpost.com/living/a-day-at-the-jadughar-close-encounters-with-bangla-525861.html)। তিনি এই পত্রিকার সংস্কৃতি সম্পাদক। তিনি লিখেছেন, তিনি জানতেন ঢাকায় সবাই বাংলায় কথা বলে, কিন্তু কলকাতা থেকে বিমানে চড়ে একটা নতুন শহরে এসে সর্বত্র বাংলা দেখতে ও শুনতে কেমন লাগে, এটা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। কলকাতার বাংলার সঙ্গে হিন্দি আর ইংরেজির মিশেলের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সন্দীপ লিখেছেন, 'হাউ বাংলা ম্যাটারস মোর ইন ঢাকা দ্যান কলকাতা।'

সন্দীপও ঢাকায় এসেছেন হে সাহিত্য উৎসব উপলক্ষে। বাংলাদেশ সম্পর্কে বাইরের জগতে অনেক সময় অনেক ভুল ধারণা থাকে। ১৯৯৫ সালে আমি যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে যাই, আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কেমন করে এলে? তোমাদের দেশে তো উড়োজাহাজ নেই... ।' আমি বললাম, আমি সাঁতার কেটে এসেছি। এই জন্যই দরকার হে ফেস্টিভ্যালের মতো উৎসব। বিদেশি লেখকেরা এসেছেন, সাংবাদিকেরা এসেছেন, তাঁরা দেখছেন, লিখছেন। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তুলনাহীন আতিথেয়তা, ঋদ্ধ সাহিত্য, অকৃত্রিম ভাষাপ্রেম, কর্মমুখর বর্তমান আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের খবর তাঁরা জেনে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে আমাদের সমৃদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতি হতে পারে সবচেয়ে কার্যকরী, সবচেয়ে উপযুক্ত ও সুন্দরতম হাতিয়ার।

হে সাহিত্য উৎসবের চত্বরে গিয়ে আমি তাই দাঁড়িয়ে থাকি, হাঁটি, মিশে যেতে চাই। ১৫ নভেম্বরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাহমিমা আনাম বলেই ফেললেন, 'আমার একটা কাজ হবে সেলিনা হোসেনের অনুবাদ বের করা। আমি এটা করবই।' তাহমিমা নিজে লিখেছেন দুটো চমৎকার উপন্যাস, এ গোল্ডেন এজ আর দ্য গুড মুসলিম; কমনওয়েলথ পুরস্কার পেয়েছেন, বহু ভাষায় বেরিয়েছে বই দুটোর অনুবাদ। আমরা হয়তো নাম নিতে পারব মনিকা আলীর, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখিকার। কিন্তু বিএনপি সরকারের আমলে মনিকা আলীকে বাংলাদেশের ভিসা দেয়া হয়নি, এই কথা যতবার মনে হয়, ততবারই লজ্জায় অধোবদন হয়ে যাই।

কিন্তু তাহমিমা তো একা নন। তাহমিমা একা হলে আমাদের চলবেও না। ভারতের ইংরেজি লেখকেরা পৃথিবীজোড়া নাম করেছেন, পাকিস্তানের লেখকদেরও এখন অনেক সুনাম। এমনকি আফগানিস্তান থেকেও বিখ্যাত লেখক বেরিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে পাড়ি দিতে শুরু করেন স্বাধীনতার পর, মূলত আশির দশকে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা এখন বড় হয়ে কর্মজগতে প্রবেশ করেছে। আমাদের ছেলেমেয়েরাও শিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছে, ইংরেজি ভাষা ও বিশ্বসাহিত্য রপ্ত করছে। তারা এখন লিখতে শুরু করেছে ইংরেজিতে। যেমন সাকিব আল হাসানদের বেলায়, তেমনি তাহমিমা আনামদের বেলায়ও বলতে হবে, জয় করার জন্য পড়ে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব।

ঢাকার হে সাহিত্য উৎসবে কত কী যে হলো! আমি হয়তো একটা অধিবেশনে বসে আছি, আমার মন পড়ে রয়েছে পাশের ঘরে, সেখানে আরেকটা প্রাণবন্ত আলোচনা হচ্ছে, ঠিক তখনই বাইরের মঞ্চে হয়তো কবিতা পড়ছেন সৈয়দ শামসুল হক আর বিক্রম শেঠ। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টাতে যে যাই। মাঝেমধ্যে তাই কোনো অধিবেশনেই যাই না। পুকুরপাড়ে বসে থাকি, কলকাতা থেকে এসেছেন কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়, কবি গৌতম চৌধুরী, সঙ্গে পেয়ে যাই মশিউল আলম, শাহীন আখতার, পারভেজ হোসেন, সাজ্জাদ শরিফকে। আড্ডা দিই।

বাংলা একাডেমীর নতুন ভবনটা খুব সুন্দর আর কাজের হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

পুকুরের পানিতে সুন্দর রাজহাঁস।

ভাবি, কেমন হতো, যদি আজ সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারা জীবন মঞ্চস্থ হতো মেক্সিকোয়, স্পেনে, ফ্রান্সে। হাসান আজিজুল হকের মা-মেয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসার কি গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের গল্পের চেয়ে কোনো অংশে কম? সমাপনী অধিবেশনে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলছিলেন, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বিভূতিভূষণ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ নোবেল পুরস্কারের যোগ্য ছিলেন। আমি বলি, তেমন করে তুলে ধরা হলে শামসুর রাহমানও নোবেল পেতে পারতেন। ওই তুলে ধরার কাজটা তো করতে হবে। সাহিত্য খুব দেশ-কাল-সংস্কৃতিসাপেক্ষ ব্যাপার। অনুবাদে ঠিক যে সবটা ফুটিয়ে তোলা যায়, তা নয়। একজন লেখককে তাঁর নিজের জনগোষ্ঠীর কাছেই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে হয় আগে। আমাদের ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান তা-ই হয়ে উঠেছিলেন, নূরলদীনের সারা জীবন আর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়-এর সৈয়দ শামসুল হকও। বহির্বিশ্ব তাঁর খবর রাখে না। কিন্তু তাদের রাখতে হবে।

বলছিলাম, বাংলাদেশের ইংরেজি লেখকদের কথা। তাঁরা নিজেরা ভালো লেখাটা লিখুন, তাঁদের মাধ্যমে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হোক, সেটা তো আমরা চাই-ই। কিন্তু আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁরা করতে পারেন, যা করে দেখিয়েছেন মাহমুদ রহমান। যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এই লেখকের ছোটগল্পের বই কিলিং দি ওয়াটার বেরিয়েছে দিল্লি থেকে। নিজের লেখার পাশাপাশি তিনি একটা দারুণ কাজ করেছেন। মাহমুদুল হকের কালো বরফ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। ব্ল্যাক আইস নামে বইটি বেরিয়েছে দিল্লি থেকে। আমার মনে হয়, আমাদের তরুণ ইংরেজি ভাষার লেখকেরা যদি মাহমুদ রহমানকে এই ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে নেন, নিজেদের মৌলিক রচনার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের সমকালীন শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো অনুবাদ করতে শুরু করেন, তাহলে খুব একটা কাজের কাজ করা হবে।

হে সাহিত্য উৎসবে দুই বাংলার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন দেবেশ রায় আর সৈয়দ শামসুল হক। সঞ্চালক সাজ্জাদ শরিফ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন–দুই দেশ, এক ভাষা, দুই সাহিত্য, নাকি এক সাহিত্য? দেবেশ রায় আর সৈয়দ শামসুল হক দুজনেই একমত যে দুই বাংলার সাহিত্য আর অভিন্ন নেই, আলাদা হয়ে গেছে।

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ যে বাংলাদেশে, তা আমরা জানি। বাংলাদেশের মানুষ বাংলাকে পেয়েছে রক্ত আর অশ্রুর বিনিময়ে, তার দেশটাও তার ভাষার নামে। এই বিষয়ে তাদের আবেগ কোনো যুক্তি মানতে চায় না। তবু বারবার করে বলি, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের নোবেল পুরস্কার ভাষণটির কথা, যেখানে তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন উইলিয়াম ফকনারকে: মানুষের পরাজয় মেনে নিতে আমি অস্বীকার করি। মানুষের পরাজয় নেই, তা এ জন্য নয় যে তার ভাষা আছে। তা এ জন্য যে তার আত্মা আছে। বাংলাদেশের মানুষের যে আত্মা আছে, বাইরের জগৎটা তা জানতে পারবে, যদি তারা আসে এই দেশে। হে সাহিত্য উৎসবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিথিরা ভাষা নিয়ে আমাদের আবেগ লক্ষ করে অভিভূত, যেকোনো উপলক্ষে আসা যেকোনো বিদেশি আমাদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ, ঢাকায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনের পরে ক্রিকইনফো ডটকম লিখেছিল, বাংলাদেশ বিশ্বকাপকে তার আত্মা ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভাবুন একবার, ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে যদি কেউ যায় শহীদ মিনারে, পয়লা বৈশাখে যদি কেউ যায় রমনা এলাকায়, বাংলার অবিনশ্বর আত্মার কল্লোল কি তার হৃদয়ে মহাসমুদ্রের গর্জন তুলবে না?

হে উৎসবে বসে এসব ভাবি। ওই ওখানে মুহম্মদ জাফর ইকবালকে ঘিরে ধরেছে শত শত তরুণ। ওই যে কবি মহাদেব সাহা এসেছেন, অভিবাদন জানাই তাঁকে। নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে হাত মেলাই। কবি মুহাম্মদ সামাদ, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, আসাদ চৌধুরী, রুবী রহমানের সঙ্গে কথা বলি। তারিক সুজাত, আসলাম সানী, কিংবা আমীরুল ইসলামের সঙ্গে কুশল বিনিময় করি। দূর থেকে দেখি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে। এই যে বহুদিন পরে আমাদের পথ চলার সঙ্গী আর পথপ্রদর্শকের সঙ্গে মোলাকাত হয়, উৎসব তো এই জন্যই।

ফিলিপ হেনশার যে এত বড় লেখক জানতামই না। তিনি তো দেখি বুকার পুরস্কারের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে মা বইয়ের অনুবাদ ফ্রিডম'স মাদার দিয়েছিলাম আগের রাতে, পরের সকালে তিনি বললেন, 'রাতে ঘুম হচ্ছিল না, তোমার বই পাঁচ ঘণ্টায় শেষ করে ফেলেছি।' আমি তাঁর বই সিনস ফ্রম আর্লি লাইফ সংগ্রহ করি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা, একাত্তরে বাবা-মা যে শিশুকে কাঁদতেও দিত না, পাছে পাকিস্তানি সেনারা কান্নার আওয়াজ শুনে ফেলে, এই বিষয়টা তাঁর বইয়ের একটা উপজীব্য।

ফিলিপ আমার গোটা বই পড়ে ফেলেছেন, মঞ্চে বসেই আমি তাঁর বই পড়তে থাকি। প্রথম লাইন, 'ইভেন দি বেস্ট অব এ ডগ স্মেলস গুড টু ইউ, ইফ ইট'স ইংলিশ।' পরের লাইনটা রোমান হরফে লেখা বাংলা বাক্য, এটা আমিও রোমান হরফেই তুলে দিই—'Ingrizi kuttar gu-o tomar khache bhalo.'

এই ধরনের বিতর্ক আজও আমাদের সমাজে রয়ে গেছে। তবে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, ১৯০টা দেশ বা অঞ্চলে প্রথম আলোই পড়া হয়, তখন আমাদের আর কূপমণ্ডূক হয়ে থাকার অবকাশ নেই। পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের কণ্ঠস্বর।

ফিলিপ কিন্তু ওই গল্পটা বানিয়ে লেখেননি। একাত্তরে বাবা-মায়েরা শিশুদের কাঁদতে দিতেন না, এটা আমরা জানি। কিন্তু একটা ঘটনা ছিল খুবই মর্মস্পর্শী। পাকিস্তানি সেনারা আসছে। একটা পরিবার পালিয়ে একটা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। পাশের রাস্তাতেই সেনারা। পরিবারটির সঙ্গে একটা শিশু। সে হঠাৎ কেঁদে উঠল। মা তার মুখ চেপে ধরলেন। শিশুর কান্না তাঁকে থামাতেই হবে। সেনারা যখন চলে গেল, তখন মা দেখলেন, শিশুটি বেঁচে নেই।

আমাদের কণ্ঠস্বর বন্দুকের নলের মুখে আর বুটের শব্দের সন্ত্রাসে আমরা বহুদিন চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এবার আমরা চিৎকার করে কাঁদব। নতুন বিশ্বের দ্বারে ব্যক্ত করতে হবে আমাদের অধিকার। জগৎ দেখুক, বাংলাদেশ আসছে। আমরাও জানি, বাংলাদেশের বাইরেও জগৎ আছে।

২৫-১১-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী যে ভালো আমার লাগলো!

'কী যে ভালো আমার লাগলো আজ
এই সকালবেলায় কেমন করে বলি।
কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর।'

লিখেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু, এমনি এক হেমন্তে, সেই কত যুগ আগে, চিল্কা হ্রদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে। আর আমার আজকের সকালটিতে কী যে ভালো লাগছে, কেমন করে বলি। আবহাওয়া সত্যি সুন্দর, শিশিরকণা ঝরে পড়া শিউলির বোঁটায়, আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। কিন্তু সেও তো বাহ্য! অন্তরের জানালায় রোদ উঁকি দিচ্ছে। এমন তীব্র ভালো লাগার মুহূর্তে চোখে অকারণে জল চলে আসে। একটা বাক্য বারবার করে নিজেকে বলি, 'আজ বড় মানুষ না, আমাদের ভালো মানুষ দরকার।' এই সোনার হরফে লিখে রাখার মতো উক্তিটি যিনি করেছেন, তাঁর নাম আছমা খাতুন। তিনি পরিচ্ছন্নতাকর্মী। কিশোরগঞ্জের করিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঝাড়ুদারের কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৯১ সালে। নিজের মমতাভরা হৃদয় তাঁর কাজের পরিধি আপনিই বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি নবজাতকের শুশ্রূষা করেন। ১৭ হাজার নবজাতকের পরিচর্যা করেছেন। 'নিজের জীবন আর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি, দিন দিন আমাদের আন্তরিকতা কমে যাচ্ছে। সবাই যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি। সবাই অর্থের পেছনে দৌড়াই। আগের চিকিৎসকেরা আগে রোগীকেই সুস্থ করতেন। পরে প্রাপ্য নিতেন। এখন টাকাই আগে। আমার মনে হয়, আজ বড় মানুষ না, ভালো মানুষের বড় দরকার।' আছমা খাতুনের এই কথা আমার বুকের গভীরে নাড়া দেয়। উপলব্ধির কোন্ স্তরে উন্নীত হলে একজন শ্রমজীবী নারী এই রকমের একটা কথা বলতে পারেন।

না, আছমা খাতুন, আপনার কথা পুরোটা ঠিক নয়। সবাই অর্থের পেছনে দৌড়ায় না। কাজের পেছনে ছোটে, অনেকেই আছেন, অকাজের পেছনেও ছোটেন, নিজের খেয়ে নিজের পরে, পরের ভালোর জন্য প্রাণপাত করেন। এই দেশে এই সমাজে তেমন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছমা খাতুনের লেখাটি প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যার দ্বিতীয় পর্ব 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে'-তে প্রকাশিত হয়েছে ২৪ নভেম্বর ২০১২। ওই সংখ্যাতেই তো আমরা পড়লাম পলান সরকারের কথা, রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় তিনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বই বিতরণ করতেন, এখন পরিণত হয়েছেন বইপড়া আন্দোলনের প্রতীকপুরুষে। পড়লাম দিনমজুরের সন্তান আরজিনা খাতুনের কথা, যিনি ৩০০ নারীকে নিয়ে পল্লিসমাজ নামের সমিতি গড়েছেন, নিজেদের ভাগ্য বদলানোর কাজ করছেন, নারীর পাশে নারীকেই দাঁড়াতে হবে বলে ডাক দিচ্ছেন। নক্ষত্রের মতো আরও কত নাম নেয়া যাবে ওই সংখ্যাটা থেকে, বৃক্ষবন্ধু কার্তিক পরামানিক, চায়ের দোকানদার আবদুল খালেক, যিনি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেছেন, এখনো ওই স্কুলের পাশে চা বিক্রি করেন, টিভি মেকানিক থেকে সৌরশক্তিচালিত আইপিএসের প্রবর্তক আবদুর রহিম, বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা শিবুপদ বিশ্বাস, সুগন্ধি চালের সংগ্রাহক আবদুল বাছিত সেলিম, শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিজয় কুমার, বিষমুক্ত কৃষির প্রচারক গিরিশ চন্দ্র রায়, গাছদাদা আজিজুল হক, গ্রামে খেলোয়াড় তৈরির কারিগর মো. বাদশারুল ইসলাম, বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসী আকবর আলী, গরিব শিক্ষার্থীদের বন্ধু পাঠশালার নির্মাতা মো. আবু রায়হান, ক্রিকেট ব্যাট তৈরি করে অভাব দূর করতে পারা নিলুফার ইয়াসমিন, পাঠশালা প্রতিষ্ঠাতা সুবীর বিশ্বাস, সুন্দরবনের অনন্য স্কুল অনন্যসাধারণ শিক্ষক নুরুল আলম, চলনবিল হাসপাতালের ডা. খলিলুর রহমান, কানাই মাস্টার কানাই চন্দ্র দাস, কিংবা কারুশিল্পী আনোয়ার হোসেন, আদিবাসী বস্ত্রের প্রসারী মঞ্জুলিকা চাকমা, ভাওয়াইয়া গানের হারুন অর রশীদ, আইসক্রিমের কাঠির কারিগর প্রদীপ সরকার প্রমুখের কথা। এঁরা সবাই গ্রামে থাকেন, অনেকেই বিরূপ অর্থনৈতিক পটভূমিতে কাজ করেছেন, কিন্তু সবাই নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। সৃজনশীলতা, পরিশ্রম, সাধনা আর মানবকল্যাণের লক্ষ্য তাঁদের একেকজন নায়কে পরিণত করেছে, আমরা যাঁদের বলে আসছি বিশাল বাংলার নেপথ্যের নায়কেরা। এঁরা ভালো মানুষ হয়েছেন আগে, কাজেই এঁরাই আমাদের প্রকৃত বড় মানুষ।

প্রথম আলো তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যার দ্বিতীয় পর্বে সত্যি সত্যি বাংলাদেশের হৃদয় হতে অপরূপ রূপে বের হয়ে আসা বড় মানুষ আর ভালো মানুষদের কথা বলে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছে। আজকে, হেমন্তের এই সকালে সবুজ গাছের পাতায় পাতায় আলোর যে ঝিলিক, তা-ই যেন ঠিকরে পড়ছে প্রথম আলোর পাতায় পাতায়। বাংলার এই নিজস্ব নায়কদের পাশাপাশি এই সংখ্যাতেই আমরা পড়লাম সেই সব বিদেশি বন্ধুর কথা, যাঁরা বাংলাদেশে এসেছিলেন কোনো না কোনো কার্যোপদেশে, তারপর বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাদের কী এক মায়ার বন্ধনে আটকে ফেলেছে, তাঁরা বাংলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের সেবার কাজ করে চলেছেন। এঁদেরই একজন জুলিয়ান ফ্রান্সিস, যিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন সেই ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে, যিনি ওই সময় অক্সফামকে চিঠি লিখেছিলেন, বলেছিলেন, বিশ্বসম্প্রদায় যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য সাহায্য না দিলে এবং অবকাঠামো দ্রুত মেরামত করা না হলে বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে নাও পারে। সেই জুলিয়ান ফ্রান্সিস আজ লিখছেন, 'আমার জন্য খুবই আনন্দের বিষয় যে আমার ওই ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে।' বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে শুধু টিকে আছে তা নয়, ভালো করছে। তিনি লিখেছেন, 'এখন আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, কেউ আর না খেয়ে মারা যায় না।' অথচ জনসংখ্যা এখন ১৯৭২-এর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। তিনি বলছেন আমাদের কৃষিক্ষেত্রের সাফল্যের কথা; বলছেন, ১৯৭২ সালে ঢাকার রাস্তায় খুব কম নারীকেই দেখা যেত, এখন মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে নাটকীয় অগ্রগতি হয়েছে, আর পোশাকশিল্পের বিকাশ নারীর ভাবমূর্তি বদলে দিতে সাহায্য করেছে।

এই কথাগুলো এবং এমন অনেক সাফল্যের কথা আমরা পড়েছি প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যার প্রথম পর্ব উজ্জ্বল অর্জন-এ, ২৩ নভেম্বর ২০১২। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ লিখেছেন, বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র নয় কেন। অধ্যাপক চিকিৎসক মো. নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। কৃষিক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া বিপ্লবের কথা বলেছেন মাহবুব হোসেন, লিখেছেন 'সাফল্যের আকাশে জ্বলজ্বলে তারা'। জনস্বাস্থ্যে আমাদের আছে অলৌকিক অর্জন, জানিয়েছেন আহমদ মোশতাক চৌধুরী। যেমন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমাদের সাফল্যের কথা শুনেছি অধ্যাপক এ কে এম নুর-উন-নবীর কাছে। আজকে আপনারা যে কাগজটি হাতে পেয়েছেন, তাতে স্পেনের রানি সোফিয়া থেকে শুরু করে বিল গেটসের পিতা উইলিয়াম গেটস হয়ে সৌরভ গাঙ্গুলীর মুখ থেকে শুনতে পাবেন বাংলাদেশের সাফল্যের ব্যাপারে প্রশংসার কথা। সত্যি, সুকান্তের ওই পঙ্‌ক্তিগুলো বারবার করে বলতে হবে, 'সাবাস, বাংলাদেশ, এই পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়'।

১৩ নভেম্বর আমরা গিয়েছিলাম রাজবাড়ীর অজপাড়াগাঁ পদমদিতে। ওখানে বিষাদ-সিন্ধুর লেখক মীর মশাররফ হোসেনের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ছিল। আমার সঙ্গে ছিলেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান আর সভাপতি আনিসুজ্জামান। রাতের বেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। আশপাশের গ্রামের মানুষ ভিড় করে সেই অনুষ্ঠান দেখছে। নারী-পুরুষ শিশু বৃদ্ধ। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, একজন দর্শকও নেই যার পরনে মলিন ছিন্ন বস্ত্র। প্রায় সব কিশোর-তরুণ-যুবক জিনসের প্যান্ট পরা, তাদের গায়ের পোশাকটাও ঝকঝকে। শুধু পোশাক নয়, তাদের চোখেমুখে উজ্জ্বলতা, কারও মুখে দীনতার কোনো চিহ্ন নেই। এটা একটা অজপাড়াগাঁ? একটা উপজেলা সদরও তো এটা নয়! আশ্চর্য তো। বাংলাদেশ কখন পাল্টে গেছে আমার নজরের বাইরে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. আনিসুজ্জামানকে আমার পর্যবেক্ষণটা জানালাম, স্যার বললেন, যারা বলে ৪০ বছরে কোনো অগ্রগতি হয়নি, তাদের ডেকে এনে দেখাও।

আসলে আমাদের এই সমুদয় উন্নয়নের মূলে আমাদের স্বাধীনতা। আর আমাদের এই চমৎকার উন্নয়নের মূল কারিগর আমাদের দেশের মানুষ, সাধারণ মানুষ, পরিশ্রমী সৃজনশীল উদ্যমশীল মানুষ। তাই তো বাংলাদেশ সম্পর্কে ভাবতে বিশ্বের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে, সুশাসনের অভাব আর দুর্নীতি সত্ত্বেও দেশটা এত উন্নতি করছে কী করে, একে তাঁরা নাম দিয়েছেন 'বাংলাদেশ প্যারাডক্স'। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ যার বাংলা করেছেন 'উন্নয়ন ধাঁধা'।

শওকত হোসেনের লেখা (২৩ নভেম্বর ২০১২) থেকে জানলাম, বাংলাদেশকে এখন রাখা হচ্ছে নেক্সট ইলেভেন কিংবা ফ্রন্টিয়ার ফাইভ-এ। মানে যে ১১টা বা পাঁচটা দেশ এরপর পৃথিবীতে ভালো করবে, বাংলাদেশ তাদের একটা। চীন তৈরি পোশাকের প্রতিযোগিতায় আর নিজেকে রাখছে না, ভারত তার বাজার বাংলাদেশের জন্য খুলে দিচ্ছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে উল্লম্ফন দেখা দেবে। অন্য সব হিসাব বাদ দিন, ৯৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে জিপিএ-৫ পাচ্ছে, ২০ বছর পর এরা যদি কৃষকও হয়, হবে আলোকিত কৃষক, বিদেশে গেলে হবে শিক্ষিত দক্ষ শ্রমিক। সেই বাংলাদেশ একটা সম্পন্ন বাংলাদেশ হবেই, এটা আমার চ্যালেঞ্জ।

কিন্তু ২৩ নভেম্বরের 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সংখ্যাটিতেই মাননীয় স্পিকার আবদুল হামিদের লেখার শিরোনাম, 'রাজনীতিতে সহিষ্ণুতার অভাব'। মাহফুজ আনাম লিখেছেন, 'বাইশ বছরের গণতন্ত্র দিয়ে আমরা কী করেছি'? সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান লিখেছেন, 'বুড়িগঙ্গা মরুক এটাই কি ওরা চায়'?

আসলে আমাদের বাংলাদেশ তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এই অগ্রগতি আরও বেগবান হতো, আরও সুন্দর হতো, যদি আমাদের রাজনীতির সংঘাতটা একটা পরিমিতির মধ্যে থাকত, যদি আমরা সুশাসন পেতাম, যদি আমাদের কৃষক, শ্রমিক, অভিবাসীদের কষ্টার্জিত টাকা তানভীরেরা কিংবা শেয়ার কেলেঙ্কারির হোতারা বা দুর্নীতিবাজ সুপুত্রেরা বাইরে পাচার না করত। আর আমাদের উন্নয়নের প্রধান বলি হচ্ছে আমাদের পরিবেশ, আমাদের নদী, আমাদের কৃষিজমি বা খোলা মাঠ।

আমরা কি দুর্নীতিমুক্ত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন, পরিবেশের প্রতি যত্নশীল রাজনীতি কোনো দিনও পাব না? আজ আশার পসরা সাজানোর দিন। আজ প্রথম আলোর চরণধ্বনি বেজে উঠেছে ভোরের আকাশে। আজ আমরা বরং আছমা খাতুনদের কথা শুনব, তাঁদের কাজ থেকে প্রেরণা নেব। এই দেশে ভালো মানুষ আছেন, বড় মানুষদের এখন ভালো মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

০৪-১২-২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা-মেয়ের সংগ্রাম কি শেষ হবে না?

কবি রুবি রহমানের সঙ্গে বহু দিন দেখা করার সাহস করে উঠতে পারিনি। তাঁর মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমার ছিল না। তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয়েই যায়, তাঁকে কী বলব, তা আমি জানতাম না।

ঘটনার তিন বছর পেরিয়ে গেল। গত ৩ আর ৪ ডিসেম্বর ছিল রুবি আপার সন্তান ও স্বামীর মৃত্যুর তৃতীয় বার্ষিকী।

রুবি আপার ছিল সুখের সংসার। তাঁর স্বামী দেখতে ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের মতো। শ্রমিকনেতা নূরুল ইসলাম। সদালাপী বিনয়ী এই ভদ্রলোককে মনে হতো অজাতশত্রু। কবি রুবি রহমান মানেই যেন স্নিগ্ধতা। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তায় বৃষ্টিধোয়া কাঁঠালচাঁপা ফুলের শান্ত স্নিগ্ধতা। তাঁর মতোই তাঁর কবিতাও খুব পরিমিত, সুরুচি-সুন্দর। তাঁকে দেখে আসছি সেই ১৯৮৭ সাল থেকে, জাতীয় কবিতা উৎসব উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে কবি রুবি রহমান আসতেন। সঙ্গে আসত তাঁর কিশোরী মেয়েটি–মৌটুসী ইসলাম।

রুবি রহমানের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ হৃদ্যতা আছে। দেখা হলেই আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বার্তা বিনিময় ঘটে যেত। রুবি রহমান আমার কাছে কবিতা চাইতেন। তিনি কালি ও কলম-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেয়ার পরও আমার কাছে গদ্য চাননি, কবিতাই চেয়েছেন। তিনি আমাকে বলতেন, 'আনিস, আমি কিন্তু তোমার কাছে কবিতাই চাইব। গদ্য আমি তোমার কাছে চাই না।'

আমি খুব খুশি হতাম।

রুবি আপার কাছ থেকেও আমি আশা করতাম কবিতার অপূর্ব পঙ্‌ক্তিমালাই।

এক ছেলে তমোহর, এক মেয়ে মৌটুসী, কবি রুবি রহমান আর শ্রমিকনেতা গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি নূরুল ইসলাম; তাঁদের ছিল সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা ছবির মতো সংসার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুবি আপা ২০০৮ সালে গেলেন আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, আন্তর্জাতিক লেখকদের আবাসিক কর্মসূচিতে। আপনারা যাঁরা আমার লেখা নিয়মিত পড়েন, তাঁরা জানেন, ২০১০ সালে একই কর্মসূচিতে বাংলাদেশ থেকে আমিও গিয়েছিলাম। ওখানে কী কী করেছি, তার কিছু কিছু বর্ণনা আপনারা প্রথম আলোর এই কলামেই গত বছর পড়েওছেন। রুবি রহমানও আনন্দের সঙ্গেই গিয়েছিলেন আমেরিকায়। ৩ মাসের কর্মসূচি তখন শেষ। তিনি এসেছেন ওয়াশিংটন ডিসিতে। তাঁর মেয়ে মৌটুসীর বাসায়। মৌটুসী কাজ করেন একটা বিশ্বসংস্থায়। ঢাকায় রুবি আপার ছেলে ৩৮ বছরের তমোহর আছে। আছেন নূরুল ইসলাম। প্রোগ্রাম শেষ। মেয়ের বাসায় কয়েক দিন থেকেই ঢাকা ফিরে আসবেন রুবি রহমান।

ঢাকায় সে সময় চলছে নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়ে উত্তেজনা। সামনে নির্বাচন। নূরুল ইসলাম প্রার্থী হবেন মহাজোট থেকে, সেই রকমেরই প্রস্তুতি চলছে।

ঠিক এই সময় ঢাকায় ঘটে যায় সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা। ৩ ডিসেম্বর রাতে লালমাটিয়ার ফ্যাটে কী একটা রহস্যময় বিস্ফোরণ ঘটে, তাতে সে রাতেই মারা যান তমোহর, পরের দিন মৃত্যুবরণ করেন নূরুল ইসলাম।

কীভাবে খবর পেলেন কবি রুবি রহমান?

কীভাবে তিনি ছুটে এলেন ঢাকায় এটা দেখতে যে তাঁর ছেলে ও স্বামী আর নেই?

কীভাবে এসেছিলেন মৌটুসী? তিনি তাঁর বাবা ও ভাইকে আর কোনো দিনও দেখবেন না।

রুবি রহমানের সামনে এরপর থেকে দাঁড়াতে পারি না। তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারি না। তাঁকে একটা সান্ত্বনার বাক্যও আমি বলতে পারিনি। স্বামী আর পুত্রকে রেখে আমেরিকায় গিয়ে ফিরে এসে যিনি দেখেছেন তাঁদের মৃতদেহ, সেই মানুষটাকে কীভাবে সমবেদনা জানাতে হয় আমি জানি না।

এই পরিবারটি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সচেতন মানুষ, সেই দিন থেকে নূরুল ইসলাম ও ইসলাম তমোহর নিহত হওয়ার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চেয়ে আসছে। গত পরশু, শনিবার, ৩ ডিসেম্বর ২০১১, তাঁদের মৃত্যুর তৃতীয় বার্ষিকীতেও দুটো কর্মসূচি পালিত হয়েছে। দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় মৌন মানববন্ধন হয়েছে। সেখানে মুহম্মদ জাফর ইকবালসহ অনেকেই দাঁড়িয়েছিলেন হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে প্রকাশিত পোস্টার শরীরে সেঁটে। মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, 'বিজয়ের মাস এলে মানুষ আনন্দ বোধ করে। কিন্তু তিন বছর ধরে ডিসেম্বরে আর আনন্দ করতে পারছি না। যাঁরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন, যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, তাঁদেরই একজনকে হত্যা করা হয়েছে।' তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, কয়েক দিন আগে নূরুল ইসলামকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছিল। আমরা জানতে চাই, কারা হুমকি দিয়েছিল।'

শনিবারেই বিকেল বেলা নূরুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে গঠিত নাগরিক কমিটি আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন। বক্তব্য দেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, আওয়ামী লীগের নেতা তোফায়েল আহমেদ, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, আওয়ামী লীগের নেতা নুহ-উল আলম লেনিন, পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, কবি মহাদেব সাহা। সভা সঞ্চালন করেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে উপস্থিত ছিলেন, মতিয়া চৌধুরীর মতো জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন। এর আগে, সৈয়দ আশরাফুল ইসলামও নূরুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। রুবি রহমান নিজেই এখন আওয়ামী লীগের সাংসদ।

এরপরও মৌটুসী তাঁর ভাই হত্যা, পিতৃহত্যার দাবিতে সংগ্রাম করতে করতে যেন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছেন। রুবি রহমান যেন ভেঙে পড়ছেন।

রুবি রহমান আর মৌটুসী এই মা-মেয়েকে যেন উজানস্রোতে নৌকা বাইতে হচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই হত্যাকাণ্ডও ধামাচাপা পড়ে যাবে। এই দুই নারী কোনো দিনও তাঁদের স্বজন হত্যার বিচার পাবেন না।

এই আশঙ্কার কারণ আছে। কারণ, যাকে তাঁরা বলছেন হত্যাকাণ্ড, কেউ কেউ তাকে একটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে চান। প্রচার করা হয়েছে, ফ্রিজ বিস্ফোরণে এই ঘটনা ঘটেছে।

অথচ ফ্রিজের গ্যাস সিলিন্ডার অত আছে। ফিজের সঙ্গে বিদ্যুতের কোনো সংযোগ ছিলই না।

বলা হয়েছে, শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। অথচ শর্টসার্কিটের কোনো চিহ্নই নেই ওই গৃহে।

তাঁরা বলছেন, ওই দিন তাঁদের বাসগৃহের প্রবেশদ্বারের চাবি বাঁকানো ছিল। কে বাঁকিয়েছিল?

গ্রিলও বাঁকানো ছিল।

মৌটুসী এর আগে প্রকাশিত তাঁর লেখায় এসব প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি জানতে চান, কেই বা ২ ডিসেম্বর ২০০৮-এ নোয়াখালী সফররত নূরুল ইসলামকে ফোন করে ঋণখেলাপি হিসেবে তাঁর নাম উঠেছে বলে তাঁকে ডেকে ঢাকায় এনেছিল?

এসব প্রশ্ন নিয়ে মৌটুসী একবার সংবাদমাধ্যমের অফিসে, একবার মন্ত্রী-নেতাদের বাড়িতে কিংবা দপ্তরে, একবার পুলিশের উচ্চকর্তাদের দ্বারে হন্যে হয়ে ঘুরছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথার মালা গাঁথা হচ্ছে, কিন্তু তদন্ত ঠিক পথটা খুঁজে পায় না। এই মামলা 'চাঞ্চল্যকর মামলা হিসেবে' গণ্য করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল বিশেষভাবে এই মামলা পর্যবেক্ষণে রেখেছে। তবু তদন্ত এগোয় না কেন?

তখনই ভয়ে আমাদের শরীর হিম হয়ে আসে। আওয়ামী লীগের এমপি তাঁর স্বামী ও সন্তান হত্যার বিচার পান না! মহাজোটের সম্ভাব্য প্রার্থীকে মেরে ফেলা হলো, সেই মহাজোট বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় এল, তারপরও সেই হত্যারহস্যের কিনারা হয় না। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেই নিহতের স্মরণসভায় উপস্থিত থাকেন, সেই নিহত তাঁর মৃত্যুর বিচার পান না?

রুবি রহমানের মুখের দিকে তাকানোর সাহস তাই আমরা হারিয়ে ফেলি। তাঁর মেয়ে মৌটুসী যখন বিচারের দাবিতে জনমত সংগঠনের জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেন, আমরা তাঁকে সমর্থন দিই, কিন্তু আশ্বাস দিতে পারি না।

এবার বোধহয় সময় এসেছে সত্যিকারের একটা পরিবর্তন আনার। অর্থবহ কিছু একটা করার। শ্রমিকনেতা নূরুল ইসলাম হত্যা মামলাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়ার, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে এই 'হত্যাকাণ্ডের' সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা যাবে না, আমাদের তা মনে হয় না। মৌটুসী ইসলাম ও অন্যরা যে প্রশ্নগুলো তুলছেন, সেসবের উত্তর তো আমাদের পেতে হবে। সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পাওয়ার পরে যদি একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়, সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নিশ্চয়ই কারো আপত্তি থাকবে না।

AMARBOI.COM

৬.১২.২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাননীয় হুকুমদাতা, আপনাকে বলছি...

ইশ, সকালবেলা উঠে এ কী দৃশ্য দেখতে হলো প্রথম আলোর প্রথম পাতায়! দাউ দাউ করে পুড়ছে একটা বাস, দোজখের আগুনের মতো, 'সিলেট-হবিগঞ্জ সুপার এক্সপ্রেস' লেখাটা স্পষ্ট আর সৌকর্যময়। জানালা দিয়ে বেরিয়ে আছে একজোড়া পা, মানুষের দুটো পা, জুতো পরা। পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে ওই মানুষটা। সকালবেলা তিনি বের হয়েছিলেন জুতামোজা পরে; নাশতা করেছিলেন, প্রিয়জনের কাছে বিদায় নিয়েছিলেন, কাজে যাচ্ছিলেন কিংবা যাচ্ছিলেন আপন ঠিকানাতেই। তাঁরও জনক-জননী আছে, তাঁরও জন্মের সময় মুখে মধু বা কানে আজান দেয়া হয়েছিল। ওই মানুষটিও স্কুলে গেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন; তাঁরও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে, তিনিও ভোট দিতে ভোটকেন্দ্রে গেছেন। একটা মানুষ। একটা জলজ্যান্ত মানুষ। বিবাহিত হলে তাঁর স্ত্রী-সন্তান আছে, হয়তো। তাঁর কী অপরাধ? কেন তাঁকে জ্বলন্ত বাসের মধ্যে কাবাবের মতো পুড়তে হলো?

এ কোন্ রাজনীতি? এ কোন্ মানবিকতা? এ কোন আদর্শ? রাজনীতি মানে না নীতির রাজা? নিরপরাধ মানুষকে পুড়িয়ে মারার নাম নীতির রাজা? মানুষ মেরে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা?

১৮ ডিসেম্বর ২০১১ ঢাকাসহ সারা দেশে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো কী ঘটতে দেখলাম আমরা! সারা দেশে একযোগে বাসে আগুন, গাড়িতে আগুন, বাস ভাঙচুর, ককটেল বিস্ফোরণ। ককটেল বিস্ফোরণে ঢাকার মতিঝিলে মারাও গেছেন এক তরুণ।

এ তো স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ নয়। রাস্তায় আন্দোলন আমরাও করেছি, নব্বইয়ের দশকের উত্তাল গণ-আন্দোলনের দিনগুলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে পুলিশের সঙ্গে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ির অভিজ্ঞতা আমাদেরও কিছু আছে। বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা ছিল ওই দিন, তাতে আসার পথে পুলিশ বাধা দিয়েছে। তাতেই একযোগে সারা দেশে এতগুলো ককটেল সকালবেলাতেই ফুটতে পারে না, এতগুলো বাসে আগুন জ্বলে উঠতে পারে না, যদি না আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে, প্রস্তুতি নেয়া হয়ে থাকে। একটা ঠাণ্ডা মাথার পূর্বপরিকল্পনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আগে থেকেই নির্দেশ দিতে হয়েছে, ককটেল বানাও। গাড়ি পোড়ানোর সিদ্ধান্তটাও কাউকে না কাউকে নিতে হয়েছে এবং সেটা সারা দেশের কর্মীদের জানিয়ে দিতে হয়েছে।

জনাব পরিকল্পনাকারী ও হুকুমদাতা, অভিনন্দন! আপনার পরিকল্পনা আমাদের কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। আজ আপনি যখন নাশতা করছেন, প্রথম আলোর ১৯ ডিসেম্বর ২০১১-এর কাগজটা হাতে নিন। ওই যে মানুষটা বাসের জানালা দিয়ে পা বের করে দিয়ে ভেতরে দাউ দাউ আগুনে পুড়ে যাচ্ছেন, যাঁর মাংসের পোড়া গন্ধে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের চণ্ডীপুলে বদিকোনার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আছে, তাঁর মৃত্যুর গন্ধ, পোড়া মাংসের গন্ধে আপনার আজকের ব্রেকফাস্ট কি আরও জমে উঠল?

পত্রিকায় নানা কথাই লেখা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিএনপি-জামায়াতের পরিকল্পনা ছিল মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনার নাম করে সারা দেশ থেকে লক্ষ মানুষকে ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জড়ো করে সেখান থেকে সচিবালয়ের দিকে যাত্রা করে রাজধানী অচল করে দেয়া। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আগেই সেটা টের পেয়ে গিয়ে তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা সমাবেশে প্রবেশে বাধার প্রতিক্রিয়া ককটেল-বোমার গণবিস্ফোরণ নয়, হতে পারে না। যাত্রীভরা চলন্ত বাসে আগুন দেয়াটাকেও গণ-আন্দোলন বলে না।

একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেল চ্যানেল আইয়ের সংবাদ থেকে। ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, গোলাম আযমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ হলো তারই প্রতিক্রিয়া। গোলাম আযমের কথিত গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া দেখাতে এত বিপুলসংখ্যক গাড়ি ভাঙচুর, গাড়িতে আগুন আর বোমা ফাটানোর মহড়া!

হরতালের আগের দিন গাড়িতে আগুন একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এখন হরতালের দিনে গাড়ি চলে নিরাপদে, কিন্তু হরতালের আগের সন্ধ্যায় গাড়ি পাওয়া যায় না, রাজধানীর রাজপথে অফিসফেরত মানুষ ভোগান্তির শিকার হয় চরম। আর এইভাবে গাড়ি পোড়াতে গিয়ে, গাড়িতে গানপাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে মানুষ মারা হয়েছে অতীতে, এই শহরেই। বেবিট্যাক্সিতে আগুন দিয়ে এর চালককে জীবন্ত কয়লা বানানো হয়েছে একাধিকবার। পুরো শরীরের দগদগে ক্ষত নিয়ে বেবিট্যাক্সিচালক কয়েক দিন অকল্পনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন হাসপাতালে, তারপর একসময় ঢলে পড়েছেন মৃত্যুর কোলে–এই সব খবর আমরা ভুলতে পারি না। হরতালের আগে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিতে হবে, এটা কোন্ ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি? এ তো স্রেফ বর্বরতা। যাত্রী কিংবা চালকসমেত বেবিট্যাক্সিতে আগুন দিতে হবে–জ্বলন্ত শরীর নিয়ে কাতরাবে, গড়াগড়ি খাবে মানুষ; এই দৃশ্য দেখার মধ্যে কোন্ রাজনৈতিক পরিতৃপ্তি, কোন তৃপ্তির ঢেকুর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট্ট কন্যাটি অপেক্ষা করে বাড়িতে, বাবা আসবেন। বাবা আসেন না। মা সারা রাত জেগে থাকেন দরজা ধরে, পথ চেয়ে–এই বুঝি ছেলে ফিরে এল। ছেলে ফিরবে কী, সে তো একটা পোড়া মাংসের অবয়বহীন দলা হয়ে পড়ে আছে কোনো ভস্মীভূত গাড়ির ভেতরে।

আমাদের রাজনীতিবিদদের, আমাদের নেতাদের বুঝতে হবে, প্রতিটা জীবন মূল্যবান। অধিকার জনগণের হয় না, অধিকার হয় প্রত্যেক মানুষের। নিরাপত্তা সারা দেশের মানুষের হয় না, নিরাপত্তা হয় প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা। একটা মানুষকে হত্যা করা মানে মানবতাকেই হত্যা করা। একজন নাগরিককে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারা মানে মানবসত্যকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারা।

আগে থেকে ঘোষণা না দিয়ে হঠাৎ করে আপনি গাড়ি ভাঙতে, আগুন জ্বালাতে, ককটেল ফোটাতে কেন যাবেন? গত পরশু ঢাকা শহরে মানুষের কী ভোগান্তিটাই না হয়েছে। একদিকে যানজট, অন্যদিকে আতঙ্ক। কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে বিপদে পড়েছে মানুষ, কাজ থেকে ফেরার পথে যানবাহন পাওয়া হয়ে পড়েছে ভার। মানুষের এই সব দুঃখ-কষ্টের কোনোই মূল্য নেই আমাদের রাজনীতিবিদদের কাছে? কিসের জন্য রাজনীতি করেন আপনারা? শুধু ক্ষমতার মধু পান করার জন্য, শুধু কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার জন্য, শুধু বিরোধী মতকে দলন করার জন্য?

আর সারা দেশে একযোগে বোমা ফাটানোর মানে কী? এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জেএমবির সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের দিনগুলোর কথা। আমাদের ভয় হয়, বড় নেতাদের জেলখানায় ঢুকতে দেখে জামায়াত তার মরণকামড় দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা সারা দেশকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়ার কর্মসূচির একটা মহড়া করল মাত্র। আর পরিহাসটা দেখুন। কর্মসূচি দেয়া হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেয়ার আর মাঠে ককটেল হাতে নেমে পড়েছে স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিটি।

যে পরিকল্পনাকারীরা এই ককটেল বানানোর ও ফাটানোর পরিকল্পনা করেছে, নির্দেশ দিয়েছে, তাদের নাকে কি মাংসপোড়া গন্ধ যাচ্ছে না? আরবের সব সুগন্ধীও কি তাদের হাতে রক্তের গন্ধ দূর করতে পারবে?

হয়তো এদের কোনো ঘ্রাণেন্দ্রিয় নেই। ক্ষমতার মোহ এদের নাক-কান-চোখ বন্ধ করে দিয়েছে। এদের বিবেক বহু আগেই মারা গেছে। সাধারণ দয়া-মায়া-করুণা নামের মানবিক গুণগুলো এদের সত্তা থেকে বহু আগেই বিতাড়িত। এরা অন্ধ, এরা ক্ষমতান্ধ, এরা অন্ধ, এরা আদর্শ-অন্ধ।

এরা করতে পারে না, এমন কোনো কাজ নেই।

হে আল্লাহ, এই রকম রাজনীতি-অন্ধ, ক্ষমতা-অন্ধ, আদর্শ-অন্ধ ভয়ংকর রাজনীতিকদের হাত থেকে দেশ ও মানুষকে তুমি রক্ষা করো।

১৩-১২-২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~